ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
পঞ্চদশ সংখ্যা
জুন ২০০০ আষাঢ় ১৪০৭

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

পঞ্চদশ সংখ্যা, জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আবদুর রাজ্জাক

গোলাম মোস্তাকীম

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

কাজী হাসান ইমাম

বেগম কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

মোঃ শফিকুল হক

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
পঞ্চদশ সংখ্যা, জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈসাময়িক জার্ণাল

সম্পাদকঃ মোঃ শফিকুল হক

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৭

টেলিফোন	ঃ	৭৭১০০১০-১৫(পিএবিএক্স)
টেলেক্স	ঃ	৬৩২২২৮ পিএটিসি বিজে
ফ্যাক্স	ঃ	৭৭১০০২৯
ই-মেইল	ঃ	bpatc@bangla.net
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা
মুদ্রণে	ঃ	হাই- টেক কম্পোজিং এন্ড প্রিন্টিং লিঃ ১৪৭, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ ফোনঃ ৭১০১০৩৪,৭১০০৬৮০

LOKAPRASASANA SAMAYIKI
Vol. 15, June 2000 Ashar 1407
Quarterly Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre
Editor: Md. Shafiqul Haque
© Bangladesh Public Administration Training Centre 1407

Telephone	:	7710010-15 (PABAX)
Telex	:	632228 PATC BJ
FAX	:	7710029
E-Mail	:	bpatc@bangla.net
BPATC Library	:	315.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen Only

লোক প্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
পঞ্চদশ সংখ্যা,
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

বাংলাদেশে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা ১
মোঃ আবদুর রাজ্জাক

বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি বিশ্লেষণ ১৫
কাজী হাসান ইমাম

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ৩১
মুহাম্মদ আব্দুল কাদের

সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম ও কর্মচারীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নঃ একটি পর্যালোচনা ৬৩
এস এম জোবায়ের এনামুল করিম

তাহারা শহরঃ উন্নয়নের একটি অনুকরণীয় মডেল ৮৭
আয়েশা আজিম

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের উপর একটি সমীক্ষা ১০৮
সেলিনা আখতার

রাজনীতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ১৩১
আবেদা সুলতানা

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী,
পঞ্চদশ সংখ্যা
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

বাংলাদেশে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

মোঃ আবদুর রাজ্জাক*

Foundation Training Course in Bangladesh and some pertinent issues. Md. Abdur Razzaque

Abstract. Foundation Training in Bangladesh is the basic training for the new entrants to the Banglaesh Civil Service. Duration of this training is four months although as many 18 Special Foundation Training Courses of two months duration each were conducted by BPATC to clear the backlog of the officers. The objectives of the Foundation Training Course among others are: (i) to make the newly recruited officers aware of the environment of the country; (ii) to develop administrative skills in them; (iii) to familiarise the officers with various tools and techniques of development and; (iv) to develop espirit-de-corpse among the officers of diffierent cards; BPATC has so far conducted 25 regular Foundation Course of four months duration each and 18 Special Foundation Traning Course of two months duration each. In order to make Foundation Training more effective and meaningful regular study on Post Training Utilisation (PTU) should be conducted and to develop espirit-de-corpse among the officers equal opportunities of promotion of officers of various cadres should be ensured.

আধুনিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন ও তাদের জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সরকারকে জনসাধারণের কল্যাণ সম্পর্কে অধিক মাত্রায় সচেতন হতে দেখা যায় এবং তাদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমান কালের উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণার শুরু এখান থেকেই। এই উন্নয়ন প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হলো দেশের মানুষ। সরকারের প্রতিটি প্রকল্প, প্রতিটি নীতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে দেশের লোকের ভাগ্যোন্নয়ন করাই হলো উন্নয়ন প্রশাসনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর জন্য দরকার দক্ষ লোকবল। কেবলমাত্র যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল সৃষ্টি করা সম্ভব। সেজন্যই প্রশিক্ষণকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ (input) হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বলা হয় "Training has long been recognised as an important input to economic development" (GOB, 1986:1)বস্তুতঃ কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত Handbook of Training in Public Service এ প্রশিক্ষণের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা হলো (UN 1966: 15)ঃ The reciprocal

---

*এমডিএস, বিপিএটিসি।

process of teaching and learning a boy knowledge and the related methods of work. It is an activity in which a relatively small group of person acting as instructors, impart to the largest mass of civil servants knowledge which is belived to be useful in the work of the latter and the sametime the instructors assist the larger body of civil servants to perfect skill which are useful in their work. In brief training imparts knowledge and develops skill.

প্রশিক্ষণের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের ন্যায় শতাব্দী প্রাচীন হলেও একটি সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বিকাশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শুরু হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতিসমূহ নিজেদের জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় কিছু মৌলিক পরিবর্তনের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। কিন্তু এই দুরূহ কাজটি সাধনের জন্য যে দক্ষ ও সুযোগ্য কর্মী বাহিনীর দরকার তার অভাব তখন প্রকটভাবে অনুভব করা হয়। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের মন্তব্য (UN, 1966:2)ঃ In surveys of public administration the problem mentioned almost invariably in the first place is the lack of properly qualified and trained personnel.

একই ভাবে যুক্তরাজ্যের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৯৪৪ সালে Assheton Committee-র রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, বৃটিশ সরকারের কর্মচারীদের জন্যেও তখন পর্যন্ত কোন post entry প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর পরই সরকার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা নামক একটি দফতর স্থাপন করে এবং যুদ্ধ শেষে সেখানে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান ছিল। ১৯৫৮ সালে প্রণীত Employee's Training Act এর পূর্ব পর্যন্ত সেখানকার সিভিল সার্ভিসে কোন ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। ফ্রান্সে National School of Administration নামক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি জন্ম হয় ১৯৪৬ সালে। এভাবে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় (UN, 1966: 4)ঃ In the first ten years after the close of the War, at least a dozen other countries, distrubuted in all principal regions of the world, established institutions and began more or less comprehensive programmes for training civil servants. Instead of being unusual, unsystematic and haphazard –as it had been characterized only a few years before–training had become an aspect of personnel administration which attracted much attention and which was the subject of much experimentation.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। প্রশিক্ষণও এ পরিবর্তন থেকে বাদ পড়েনি। অনেক নতুন মতবাদ, নতুন কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে। একজন কর্মচারী তার চাকুরী জীবনের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বৃদ্ধি করছে তার দক্ষতা ও যোগ্যতা। বস্তুত তার চাকুরীর সঙ্গে আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে প্রশিক্ষণের বিষয়টি । বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন পেশার লোককে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে সারা দেশে বিদ্যমান রয়েছে বহু সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এদের মধ্যে অন্যতম।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ধারণা, উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত একজন তরুণ যখন চাকুরীতে প্রবেশ করে তখন তাত্ত্বিক জ্ঞানে সে যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ে সে থাকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । এই নবীন কর্মকর্তাকে সাধারণ প্রশাসন সম্পর্কে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাকেই বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ বলা হয়। এটি In-servic বা চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণসমূহের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের একটি প্রশিক্ষণ যা Induction Training এর অন্তর্ভুক্ত। Induction Training সম্পর্কে বলা হয় (UN,1966:62): Training which goes beyond mere orientaion and involves insturction in the performances of tasks connected with a particular position is known as Induction Training. It is called. 'Portal' or 'Vestibule' Training. কথাটি একটু পরিস্কার করে বলা যাক। প্রথমতঃ প্রশিক্ষণকে চাকুরীপূর্ব (per-entry) এবং চাকুরীকালীন (In-service) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় । চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ বিভিন্ন নামের হতে পারে। চাকুরী লাভের পর প্রথম পর্যায়ে যে প্রশিক্ষণ হয় তাদেরই একটি হলো Orientation এবং অপরটি Induction .

যদিও উভয় প্রকার প্রশিক্ষণই চাকুরী লাভের পর পরই গ্রহণ করা হয় তথাপি উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। Orientation কোর্সের মূল লক্ষ্য যেখানে প্রশিক্ষণার্থীকে সরকারী চাকুরী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও তাৎক্ষণিক একটি ধারণা দেয়া Induction কোর্সে তাদেরকে আরো গভীরভাবে পরিচিত করা হয় সরকারের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে। সরকারের রীতি-নীতি, বিধি-বিধান, আইন-কানুন ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় ঘটে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। এই প্রশিক্ষণ

দেয়ার অন্য উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষাণার্থীর চাকুরী-পূর্ব মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন মানসিকতার উন্মেষ ঘটানো যার ফলে সে নতুন পরিবেশ ও অবস্থার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। তাই বলা হয় (UN, 1972: 112): Induction is the process or bridging the gap between the previous knowledge and experience in the new comer and the requirements of the new organization so that he may become an effective working unit as quickly as possible.

Foundation Training বা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণকে অনেক দেশে Induction Training-এরই একটি পর্যায় হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। ভারতে Induction Training এর তিনটি পর্যায় রয়েছে যথা Foundation Course, Institutional or Professional Course, এবং District বা Field Training. আমাদের দেশে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণকেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ হিসাবে গণ্য করা হয়। দেশভেদে নামের ভিন্নতা থাকলেও বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সকলের ধারণা মোটামুটি একই ধরনের। আর তা হলো (UN, 1966:62): This is a general introduction to public employment. During this orientation period the civil servent obtains an understanding of his rights and duties as a public servant, his organization and his place in it and an understanding of the aims and purposes and the social usefulness of the agency as a whole. অর্থ্যাৎ সহজ কথায় "Fundational Training is that training which embraces the trainee to the future work situations of his service career (Goyal, 1988: 84)। আর এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলোঃ "Providing knowledge, imparting skills and inculcating attitudes (Goyal, 1988: 85)। SD Davis প্রথম দুটো উদ্দেশ্য এভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ "Knowledge is the cognitive (internal) possession of information, facts and theories, skill is the competence to do or to perform and activity of task" (Dais, 1979: 94), অর্থাৎ কোন তত্ত্ব, তথ্য বা মতবাদ নিজের দখলে রাখার নাম জ্ঞান আর দক্ষতা হলো কোন কাজ করার যোগ্যতার নাম।

নবাগত অফিসারদের মনোভাব (attitude) এর পরিবর্তন ঘটানো বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের তৃতীয় উদ্দেশ্য । এ প্রসঙ্গে বাটা কে ডে মন্তব্য করেন (Dey, 1983 : 826): Foundational Training is in a sense, the formative part of a Civil Servant's life, a second impressionable childhood as it were, when in the infacny of his career a desirable attitudinal mould has to be cast, intellectual transformation has to be effected and a cultural

revolution brought about, which will stand the civil servant in good stead throughout his career. মোদ্দা কথা হলো যে, একজন সরকারী কর্মচারী নিজ সংস্থা, নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং নিজের সহকর্মীবৃন্দের প্রতি যথাযথ মনোভাব প্রদর্শন করবে। এই মনোভাব সৃষ্টি, এর পরিশীলন এবং পরিমার্জন বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের যৌক্তিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে অশোক চন্দ্র ১৯৫৫ সনে তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন (Arora & Kukar, 1997: 54): Much time and wastage can be avoided by providing a certain amount of basic training to shorten and facilitate the process of learning by doing. This training has to be both general and specific. The general part compries the basic knowledge which all higher civil servants must possess like Constitution, Public Administration. Personnel Management and Economics. The special part of the basic training covers the Acts and Rules relating to the particular service, departmental procedures etc.

আরো সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা উল্লেখ করা হয়েছে রাজস্থান সরকারের ১৯৬১ এবং ১৯৭৪ সালে গঠিত State Committee on Training এর রিপোর্টে । ১৯৬১ সালে গঠিত কমিটি ১৯৬৩ সালে এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করে (Govt. of Rajasthan, 1963:5-6): New entrants into the Govt. service should at the begining of their training period collect together in a common institution and study subjects of common interest and benefit to all. ১৯৭৪ সালে গঠিত দ্বিতীয় কমিটি ১৯৭৭ সালে যে প্রতিবেদন দাখিল করে তাতে মন্তব্য করা হয় (Govt of Rajasthan 1963: 5-6): The Foundational Course caters to the need of all services. The Course should emphasize the broad context of word in a Govt. setting, the major policies, the roles and responsibilities of the civil servants.

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, যে বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেখা হয় তা হলোঃ

১। নবনিযুক্ত কর্মকর্তাকে দেশের পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত করা;
২। প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা সৃষ্টি করা;
৩। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে সমুন্নত রেখে কাজ করে করে যাওয়ার মনোভাব সৃষ্টি করা;
৪। উন্নয়ন প্রশাসনের বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের অবহিত করা;
৫। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত বিভিন্ন ক্যাডারের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে সহমর্মিতা এবং একত্রে কাজ করে যাওয়ার জন্য একটি সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলা (To develop a Spirit of ESPRIT DE CORPS).

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের উপরে বর্ণিত সাধারণ লক্ষ্য, উদ্দেশ্যাবলী ও যৌক্তিকতার আলোকে বাংলাদেশে চলমান বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যাবলী ও যৌক্তিকতা এবারে মিলিয়ে দেখা যায়।

বাংলাদেশে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের শুরু

বাংলাদেশের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর পরই এই প্রশিক্ষণ প্রবর্তনের জন্যে সুপারিশ আসতে থাকে (Shams, 1980:1): Foundation Training became a necessity for the civil service in Bangladesh following reorganization of administrative structures. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৯-৮০), দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫), Administrative and Services Re-organization Commission (1973) এবং Pay and Services Commission (1977) সুপারিশ করে যে, সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণ এবং নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। ফলশ্রুতি হিসেবে প্রশিক্ষণ জগতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয় এবং প্রশিক্ষণ দখল করে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যে সমস্ত কারণে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নতুন আঙ্গিকে চিন্তা ভাবনা করা হয় এবং প্রশিক্ষণ জগতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয় তা হলোঃ

১। Strong demand, primarily from the technical services like the engineers, doctors and other functional groups, for an open integrated

civil service, replacing the elitis-structure dominated by the former civil service of Pakistan (Ali, 1980).

২। Development management, mostly in the rural sector reqired a rapid decentralization of Govt. and establishment of new relationship between the administrative hiararchy and the local level institutions. This is epitomised by the emergence of village level institions known as "gramssarkars" or "village governments" (GOB: 1980. VII-6).

৩। Initial socialistic aspirations of the Govt. during 1972-75 led to large scale nationalization of industries which in turn called for new management responsibilities. In the rural sector, there was increasing focus on improving delivery systems of inputs, services and supplies to target groups under various intergrated rural development programmes and area development projects. These called for not only new management skills, but organizations, procedures, attitiudes and planning discipline (Islam, 1977: 52-62).

৪। Re-structuring of administration created a demand for better co-ordination and understanding amongst the various service group" (Shams, 1980: 2).

৫। Large scale recruitments on ad-hoc basis during the initial years and subsequent promotions from subordinate ranks to fill up vaccant positions at top, created an enormous backlog of training. (Shams, 1980 : 2).

উপরে বর্ণিত চাহিদার আলোকে পে এন্ড সার্ভিসেস কমিশন (১৯৭৭) প্রজাতন্ত্রের সকল সার্ভিস ক্যাডারের জন্য একটি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য সুপারিশ করে (Shams,1980: 3)ঃ A Common Foundation Training for post-entry orientation of all Public Services was proposed by the Pay and Services Commission.

প্রস্তাবিত বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল সার্ভিস ক্যাডারের সদস্যদের একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করা এবং তাদের মধ্যে একতা ও সহমর্মিতার মনোভাব (esprit de corps) সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্যে কমিশন এই প্রশিক্ষণের উপযোগী একটি পাঠ্যসূচী প্রণয়নেরও সুপারিশ করে (GOB, 1977): Functionally the Course will be designed to-

১। Equip the probationers with basic knowledge of constitutional, political economics, legal, agrarian and social framework, within which they have to work;

২। Promote a common understanding so that probationers are able to appreciate each others role in the administration;

৩। Help build up right attitudes and service of values vis-a-vis the people, inculacate the qualities of leadership and teach ogranizational and management skills which make a civil servant proficient in his duties;

৪। Impart training in selected subject areas viz, essentials of public administration, civil and criminal laws, planning and economic policy, constitutions, philosophy, history and culture.

পে এন্ড সার্ভিসেস কমিশনের প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীটি বিভিন্ন ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও দেশে চলমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতির সমস্যা ও তার নিরসনকল্পে কোন সুপারিশ রাখেনি। এ বিষয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। এতে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসহ দেশের সকল প্রশিক্ষণকে অধিকতর প্রাসঙ্গিক এবং চাহিদাভিত্তিক করার কথাও উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ (বাংলাদেশ সরকার , ১৯৮০: ৪১৮)ঃ

১। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়মাবদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীগত জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নতি সাধনের সাথে সাথে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন,

২। প্রশিক্ষণ নীতিসমূহের মূল্যায়ন, বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কাঠামো সুসংহতকরণ ও উন্নয়ন এবং পর্যায়ক্রমে এই কাঠামোর সম্প্রসারণ,

৩। প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্ধারণের জন্য প্রয়োগিক গবেষণা, দেশীয়

প্রশিক্ষণ সামগ্রীর উন্নয়ন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কৌশল ও পাঠ্যক্রম উদ্ভাবন এবং প্রশিক্ষণের প্রভাব সম্পর্কে বাস্তব মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা,

৪। প্রয়োগিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সনাক্তকরণ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থী গোষ্ঠীর আপেক্ষিক অগ্রাধিকার নির্ণয়।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ও প্রাক্তন কোটা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই নবগঠিত কোটার (প্রাক্তন সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী) উপর দায়িত্ব পড়ে ২২ সপ্তাহ (সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৭৭-ফেব্রুয়ারী ২৮, ১৯৭৮) মেয়াদী প্রথম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে তাড়াহুড়া করে কোটা এই কোর্স পরিচালনা করে। এ সম্পর্কে কোটার তদানিন্তন অধ্যক্ষ জনাব এম খালিদ শামস বলেন (Shams, 1980: 6): There was little time to evaluate, reflect or plan properly the first foundation course which commenced in September, 1977. এই কোর্সের পাঠ্যসূচীর অন্যতম বিষয় ছিল গ্রাম-সমীক্ষা । প্রশিক্ষণার্থী তাঁর নিজ গ্রামে তিন মাস কাল অবস্থান করে গ্রামের আর্থ-সামাজিক এবং প্রশাসন বিষয়াদির উপর একটি সমীক্ষা করে একটি রিপোর্ট পেশ করতেন। এছাড়া যেসব বিষয়ের ওপর তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা ছিল সেগুলো হচ্ছে (Shams, 1980)ঃ ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন খ) লোক প্রশাসন গ) বাংলাদেশ চর্চা। এর মধ্যে প্রাধান্য পায় সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। প্রশিক্ষণার্থীগণ তাঁদের মূল্যায়নে এই কোসর্কে দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের আলোকে আরো অর্থবহ ও বাস্তবভিত্তিক করে পুনঃ প্রণয়নের জন্যে অনেক মূল্যবান সুপারিশ রাখেন। এই সুপারিশের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ

১। পাঠ্যসূচীটি, অধিকতর বাস্তব এবং চাকুরীর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। একজন নবীন অফিসার চাকুরী করতে গিয়ে দৈনন্দিন যে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তার আলোকে এটি প্রণীত হতে হবে। তাত্ত্বিক এবং বইভিত্তিক বিষয়াদি যথাসম্ভব কম থাকবে।

২। পাঠ্যসূচী উন্নয়নের জন্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগিক গবেষণা কার্যক্রম চালু থাকবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপনের ব্যবস্থা থাকবে।

৩। সমগ্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত তুলে ধরার জন্যে মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে।

বস্তুতঃ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাক্তন কোটার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে কেননা কোটাই সর্বপ্রথম এই প্রশিক্ষণের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলো এবং পরবর্তীতে একে একটি পরিপূর্ণ অবয়বে বিকশিত করার দায়িত্ব পালন করেছিলো। কোটার তদানিন্তন অধ্যক্ষ জনাব এম, খালিদ শামস ও অপরাপর কর্মকর্তাবৃন্দ নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা, কর্মশালাও সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে বুনিয়াদী কোর্সের পাঠ্যসূচীর উন্নয়ন ও এর বাস্তবায়নে প্রশংসণীয় ভূমিকা রেখে গেছেন। ১৯৮৪ সন পর্যন্ত সেখানে ৪টি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি ছিল ২২ সপ্তাহ মেয়াদী এবং শেষেরটি ছিল ১৬ সপ্তাহ মেয়াদী। অতঃপর ২৮শে এপ্রিল, ১৯৮৪ তে পিএটিসি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পরিচালনার দায়িত্ব পিএটিসির ওপর ন্যস্ত হয়।

বিপিএটিসি ও বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ

পূর্ব থেকেই একটি সমন্বিত জাতীয় নীতি কাঠামোর আওতায় দেশের সকল প্রশিক্ষণ তৎপরতার সমন্বয় ও বাস্তবায়নের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছিল। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে জাতীয় প্রশিক্ষণ পরিষদ (National Training Council -NTC) গঠন করা হয় এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি (এনটিপি) প্রণয়ন করা হয়। একই সঙ্গে সমন্বিত প্রশিক্ষণ সুবিধার উন্নয়নের জন্যে প্রাক্তন কোটা, নীপা, বিএএসসি এবং এসটিআই একত্রিত করে ঢাকার অদূরে আরিচা রোডের পাশে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) স্থাপিত হয়। এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডার ও সাব-ক্যাডারের শিক্ষানবিশী অফিসারদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান পিএটিসির অন্যতম দায়িত্ব হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। কেন্দ্র তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে এযাবৎ ৪ মাস ব্যাপী ২৫টি নিয়মিত বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স এবং দুই মাস মেয়াদী ১৮টি বিশেষ বুনিয়াদী কোর্স পরিচালনা করেছে।

বিপিএটিসি পরিচালিত বুনিয়াদী কোর্সের বিশেষ করে বিশেষ বুনিয়াদী কোর্সের গুণগত মান এবং এর ফলপ্রসূতা নিয়ে আলোচনার অবকাশ থাকতে পারে। তবে এ আলোচনার সময় বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতিও বিবেচনায় আনলে বিষয়টির প্রতি সুবিচার করা হবে। বিপিএটিসি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে অনেক নতুন ক্যাডারের সংযোজন হয়। ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপযোগী অফিসারদের সংখ্যা কয়েক হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। ৪ মাস মেয়াদী কোর্স চালু রাখা এবং সকলকে বিপিএটিসিতে প্রশিক্ষণ দেয়া কোন মতেই সম্ভব নয় মনে করে সরকার ৪ মাস মেয়াদী কোর্স স্থগিত রেখে ২ মাস মেয়াদী বিশেষ কোর্সের প্রবর্তন করে এবং পিএটিসি ছাড়াও আরো ১২টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে এই কোর্স পরিচালনার অনুমতি দেয়। তখন থেকে পিএটিসিতে এই কোর্সে অনুষ্ঠিত হওয়া ছাড়াও বার্ড, আরডিএ, রেলওয়ে একাডেমী প্ল্যানিং একাডেমী, ওটিআই, সার্ডি, নীয়ার প্রভৃতি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এই কোর্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই বিশেষ বুনিয়াদী কোর্সের গুণগত মান নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বিশেষ বুনিয়াদী কোর্স শুরু করা হয়েছিল একটি Crash Programme-এর অধীনে বিসিএস এর সকল ক্যাডারের সকল সদস্যকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা গেল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য, প্রকৌশল প্রভৃতি ক্যাডারের অনেক অফিসার আছে যারা, ইতোমধ্যেই ১০/১৫ বছর চাকুরী করেছেন এবং যাদের বয়স ৪০/৪৫ বছর অতিক্রম করে গেছে। এদেরকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে তাদের চেয়ে অনেক কম বয়সী নবীন কর্মকর্তার সাথে। উভয় গ্রুপের মধ্যে বয়সের যে বিরাট ব্যবধান থেকে গেছে তাই বাধা হয়েছে তাদের মনের মিল ঘটাতে । ফলে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য esprit-de- corps বা সহমর্মিতা অর্জন এসব কোর্সে প্রায়ই সম্ভব হয়নি।

বিপিএটিসি কর্তৃক পরিচালিত বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতা

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। অবশ্য শুধু বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ নয় সকল ধরনের প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতা যাচাইয়ের একটি ব্যবস্থা থাকা অতীব জরুরী । কেননা যে প্রশিক্ষণ দেয়া হচেছ তা কার্যক্ষেত্রে কতটুকু কাজে লাগছে তা দেখা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ । বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এটি আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ একারণে যে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষাণার্থীগণ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নবীন কর্মকর্তা, যাদের পূর্ব প্রশিক্ষণের কোন

অভিজ্ঞতা থাকে না । এটি তাদের জীবনের প্রথম প্রশিক্ষণ হিসেবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতায় একটি পরিবর্তন আনায়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয়ে থাকে এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। এছাড়া চাকুরী সংক্রান্ত আইন-কানুন বিধি বিধানের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়াও এ প্রশিক্ষণের আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য। এ কারণেই প্রশিক্ষণ তাদেরকে কতটুকু পরিবর্তন করতে পেরেছে এবং প্রশিক্ষণ পরবতীকালে তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা যাচাই করা দরকার। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের ব্যবহার বা Post Training Utilization (PTU)) যাচাইয়ের জন্য একটি চলমান প্রক্রিয়া থাকা দরকার। বিপিএটিসিতে নবায়ন কোর্সের মাধ্যমে এটি করা হয়ে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রের রেক্টর মাঝে মাঝে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তাদের তত্ত্বাবধায়কদের সাথে মত বিনিময় করেও প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতা যাচাইয়ের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। এসব প্রক্রিয়ায় সুবিধাভোগীদের মতামতের কোন প্রতিফলন ঘটে না। এমতাবস্থায় পাশাপাশি সকল শ্রেণীর লোকের মতামত যাচাইয়ের একটি চলমান প্রক্রিয়া থাকলে প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতা যাচাইয়ের কাজটি আরো সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হলে বলে মনে হয়। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে পাঠক্রম প্রণয়নের কাজ করা হলে পাঠক্রমটি সমৃদ্ধতর করা সম্ভব হবে। এ জন্যে মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত সমীক্ষা পরিচালনা করা যেতে পারে।

উপসংহার

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণকে কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করার জন্যে সরকারকে আরো আন্তরিক হতে হবে এবং বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। প্রথমেই আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূর করে সকল ক্যাডারের জন্য পদোন্নতিসহ সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। বাস্তবে দেখা যায় বিশেষ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ তাদের একই ব্যাচের অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের থেকে পদোন্নতির ক্ষেত্রে দু থেকে তিন ধাপ এগিয়ে থাকেন। এরূপ ঘটনার উদাহরণ যদি একটি কর্মস্থলে কর্মরত অফিসারদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাহলে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য esprit-de-corpse শুধু ব্যহতই হয় না বরং তা এক মর্মান্তিক উপহাসে পরিণত হয়। কাজেই বুনিয়াদী প্রশিক্ষণকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর করতে চাইলে এ বিষয়গুলো দেখাও অতীব প্রয়োজন বলে মনে করি।

তথ্য নির্দেশিকা

Ali, Muhammad (1980) *Structure & Function of Central Personnel Agencies in Bangladesh.* Kualalumpur. : APDC.

Aroma, Romesh K. & Kukar (1979) Training of Public Services in India in *Training and Administrative Developmem.* Jaipur: HCM, RIPA.

Davis, SD (1997) Training Methodology in *Effective use of Training Methodologies.* London: Commonwealth Secretariat.

Dey, K. Bata (1983) *Training in the Civil Services* . IJPA, XXIX.

GOB (1977) *Report of the Pay and Services Commission, Vol.* 1. Dhaka: Govt. Press.

GOB (1980) *The Second Five Year Plan, 1980-85(draft.)*Dhaka: Govt. Press.

GOB (1986) *Training Policy for the Government Officials.* Dhaka: M/O Establishment.

Goyal. Rajni (1988) *State Civil Service Training in India.* Jaipur. RBSA.

Govt. of Rajashsthan (1963) *Report of the State Committee on Training.* Jaipur: Govt.Press.

Islam, Nurul (1977) *Developmetn Planning in Bangladesh.* Dhaka.

Shams, Khalid (1980) *Curriculum Building Through R&D Experience of COTA.* Dacca: COTA/ARR.

UN (1966) *Handbook of Training in Public Service.* New York :UN Department of Economic and Social Affairs.

UN (1972) *Report on a pilot Course on Training of Public Service Trainers.* New York: UN.

বাংলাদেশ সরকার (১৯৮০) *দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।* ১৯৮০-৮৫. ঢাকাঃ সরকারী মুদ্রণালয়।

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
পঞ্চদশ সংখ্যভ
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি বিশ্লেষণ

কাজী হাসান ইমাম*

Enivonrment Policy of Bangladesh : An Analysis. Kazi Hasan Imam

Abstract. The formulated policy of any political government reflects the development philosophy of that political party in power. A policy should be formulated based on the welfare needs of the people. In this respect, the Environment policy of Bangladesh is one of the best sectroal policies ever formulated in the country. The most important strengths of the formulated policy are of its overall policy structures, macro-thresholds, micro-level specification, right-identification of sectoral problems, formulation of a legal framework and instituational arrangements for policy implementation and above all inclusion of an action plan to address the sectoral problems fixing the resoponsibilities of different Ministries, Divisions, Departments and other relevant agences. The existence of a good Policy is not everything, but of course, It is a pre-requisite. Much more thrusts need to be given to policy intgration and development of appropriate mechanisms and instruments for policy implementation.

যে কোন সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালায় ঐ সরকারের রাজনৈতিক ও উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত হয়ে থাকে (হোসেন ও হাসান ১৯৮৯:২)। সরকার সাধারণত ব্যাপক জনসাধারণকে সামনে রেখে তাদের কল্যাণার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন করে থাকে। কোন একটি রাজনৈতিক সরকার কর্তৃক যে কোন বিষয়ে নীতি প্রণীত হওয়ার পর রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তনের পরও যদি ঐ নীতি বহাল থাকে এবং সংশ্লিষ্ট নীতিটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আংশিক বা বহুলাংশে ব্যর্থতার কারণ না ঘটে অথবা বাস্তব চাহিদার আলোকে নীতিটি আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিল করার ব্যাপারে যদি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট না হয় তবে প্রণীত নীতিটি যথার্থ কার্যকর ও সফল হিসেবে বিবেচিত হবে (ভূইঞা, ১৯৯৫: ৪-৫)। এ আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি সরকার কর্তৃক প্রণীত একটি সফল নীতি।

নীতি প্রক্রিয়ার (*Policy Process*) দৃষ্টিকোণে ষাটের দশকে শিল্পায়ন ও নগর পানি দূষণকে কেন্দ্র করে পরিবেশ প্রশ্নটি সরকার ও সীমিত পরিসরে বিভিন্ন ফোরামে উত্থাপিত হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতাত্তোরকালে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯৭৩ সালে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন এবং ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারী করা হয় (Ahmed, 1987:20)। পরবর্তীতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং পরিবেশ ও বন

* উপপরিচালক, বিপিএটিসি।

মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টিসহ পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনা বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিক পরিবেশ সমস্যা সম্বোধনে স্বয়ং সম্পূর্ণ পরিবেশ নীতি প্রণয়নের বিষয়টি একটি গণ-দাবি (Public Demands) বা অন্য কথায় নীতি সংক্রান্ত দাবির (Policy Demands) রূপ পরিগ্রহ করে (ইমাম ১৯৯৯: ১৭৯)। এ প্রক্রিয়ায় ১৯৯২ সালে পরিবেশ নীতিটি একটি সম্পূর্ণ দলিল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নীতি বিশ্লেষকদের মতে, এ প্রক্রিয়ায় প্রণীত নীতিতে কোন সরকারের রাজনৈতিক উন্নয়ন দর্শন অপেক্ষা জনগুরুত্বের বিষয়টি অধিকতর প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (Baker, 1997: 101) এবং ফলত তা একটি সফল নীতি হিসেবে প্রতিভাত হয়।

তাত্ত্বিক কাঠামো

নীতি বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণে কোন জননীতি (Public Policy) সম্পর্কিত আলোচনায় কতগুলো বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমত যে বিষয়ে কোন সরকার একটি নীতি প্রণয়ন করবে বা করেছে ঐ ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় সমস্যা সম্বোধনে সরকারের অনুধাবন যথার্থ কি -না। সরকার যদি সমস্যা অনুধাবনে ব্যর্থ হয় এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চিহ্নিত বা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয় চিহ্নিতকরণে ব্যর্থ হয়, তবে সে ব্যর্থতার দায়ভাগ প্রণীত বা প্রণীতব্য নীতির কার্যকরতার ওপর বর্তাবে। দ্বিতীয়ত সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন জননীতি কোন লক্ষ্যহীন আচরণের বহিঃপ্রকাশ নয়। অর্থাৎ নীতি প্রণয়নে সরকারের অর্জনীয় কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। কোন নীতি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে যথার্থ বাস্তবানুগ না হলে, সে নীতি কার্যকর হবে না এবং তা অচিরেই গণ-প্রতিবাদ-ইস্যুতে পরিণত হবে, যদি এ সম্পর্কে জনগণের ধারণা সুস্পষ্ট থাকে। তৃতীয়ত প্রণীত কোন জননীতি সরকারের কেবল কতিপয় বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তের সমষ্টি নয়। বরং নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সিদ্ধান্তের একটি সমন্বয় থাকতে হবে এবং ব্যষ্টিক পর্যায়ে প্রণীত। নীতি-সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তব সমস্যা সম্বোধন উপযোগী হতে হবে। যদি তা না হয়, নীতি-সিদ্ধান্তসমূহের পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়বে। চতুর্থত প্রণীত নীতি বাস্তবায়নের একটি কাঠামো ও ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। বাস্তবায়ন কাঠামো ব্যতীত যে কোন নীতি একটি অন্তঃসারশূণ্য কাগজ সর্বস্ব অঙ্গীকারে পরিণত হতে বাধ্য। পঞ্চমত যে কোন জননীতি কেবল সরকারের কাঙ্ক্ষিত করণীয়ের মধ্যেই সীমিত নয়, সঠিক অর্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রণীত কার্যক্রম পরিকল্পনা একটি জননীতির বাস্তবায়ন রূপরেখার দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত। ষষ্ঠত একটি জননীতি ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটোই হতে পারে। কোন জননীতি

যদি ইতিবাচক হয়, তবে বুঝতে হবে যে, প্রণীত নীতিতে জনকল্যাণ ও বিষয়গত সমস্যা যথার্থভাবে সম্বোধিত হয়েছে। আর যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তাতে নীতি-কাঠামোয় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সরকারের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত হলেও জনকল্যাণ মুখ্যত অবহেলিত হয়েছে এবং বিষয়গত সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা নীতি প্রণেতাগণ বিষয়গত সমস্যা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন।

উপর্যুক্ত কাঠামোর আওতায় বাংলাদেশের পরিবেশ নীতিকে (১) প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত এবং পরিবেশ প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের অনুকল্প, (২) নীতির উদ্দেশ্যসমূহ, (৩) নীতি সমন্বয়, (৪) নীতি বাস্তবায়ন কাঠামো ও ধারাবাহিকতা, (৫) কার্যক্রম পরিকল্পনা, (৬) খাতওয়ারী নীতি-সিদ্ধান্তসমূহ এবং (৭) নীতি মূল্যায়ন-এ ৭টি নীতি-উপাদানের (*Policy Elements*) আলোকে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

নীতি বিশ্লেষণ

প্রবন্ধটিতে দেশে বিদ্যমান পরিবেশ নীতিকে সামষ্টিক, ব্যষ্টিক ও নীতি মূল্যায়ন-এ তিনটি ভাগে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। জননীতি চর্চার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কাঠামোর আওতায় উদ্দিষ্ট নীতির সামষ্টিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ব্যষ্টিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রণীত নীতিটি খাতওয়ারী সমস্যাগুলো সম্বোধনে সমর্থ হয়েছে কি-না সে বিষয়গুলো পর্যালোচিত হয়েছে। এ দুটি পর্যায়ের বিশ্লেষণের আলোকে সামগ্রিকভাবে নীতিটিকে মূল্যায়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

সামষ্টিক নীতি বিশ্লেষণ

সামষ্টিক বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে পরিবেশ নীতি প্রণয়নের প্রেক্ষিত ও সরকার কর্তৃক গৃহীত অনুকল্প, প্রণীত নীতির উদ্দেশ্য, নীতি সমন্বয়, নীতি বাস্তবায়ন কাঠামো ও ধারাবাহিকতা, কার্যক্রম পরিকল্পনা, নীতি-উৎপাদ, নীতি-ফলাফল ইত্যাদি পর্যালোচিত হয়েছে।

তবে সামগ্রিক নীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, আমাদের প্রশাসনিক উপরি কাঠামো যেমন, প্রণীত নীতি, গৃহীত পরিকল্পনা, বিধিবদ্ধ আইন (*Enacted Laws*), প্রশাসনিক স্তর-বিন্যাস ইত্যাদি দৃশ্যত চমৎকার হলেও এর ভেতর কাঠামো (*Inner Structures*) যেমন, অঙ্গীকার, বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, ও পদায়ন ইত্যাদির বাস্তব চিত্র খুবই নাজুক

যদি ইতিবাচক হয়, তবে বুঝতে হবে যে, প্রণীত নীতিতে জনকল্যাণ ও বিষয়গত সমস্যা যথার্থভাবে সম্বোধিত হয়েছে। আর যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তাতে নীতি-কাঠামোয় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সরকারের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত হলেও জনকল্যাণ মুখ্যত অবহেলিত হয়েছে এবং বিষয়গত সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা নীতি প্রণেতাগণ বিষয়গত সমস্যা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন।

উপর্যুক্ত কাঠামোর আওতায় বাংলাদেশের পরিবেশ নীতিকে (১) প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত এবং পরিবেশ প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের অনুকল্প, (২) নীতির উদ্দেশ্যসমূহ, (৩) নীতি সমন্বয়, (৪) নীতি বাস্তবায়ন কাঠামো ও ধারাবাহিকতা, (৫) কার্যক্রম পরিকল্পনা, (৬) খাতওয়ারী নীতি-সিদ্ধান্তসমূহ এবং (৭) নীতি মূল্যায়ন-এ ৭টি নীতি-উপাদানের (*Policy Elements*) আলোকে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

নীতি বিশ্লেষণ

প্রবন্ধটিতে দেশে বিদ্যমান পরিবেশ নীতিকে সামষ্টিক, ব্যষ্টিক ও নীতি মূল্যায়ন-এ তিনটি ভাগে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। জননীতি চর্চার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কাঠামোর আওতায় উদ্দিষ্ট নীতির সামষ্টিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ব্যষ্টিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রণীত নীতিটি খাতওয়ারী সমস্যাগুলো সম্বোধনে সমর্থ হয়েছে কি-না সে বিষয়গুলো পর্যালোচিত হয়েছে। এ দুটি পর্যায়ের বিশ্লেষণের আলোকে সামগ্রিকভাবে নীতিটিকে মূল্যায়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

সামষ্টিক নীতি বিশ্লেষণ

সামষ্টিক বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে পরিবেশ নীতি প্রণয়নের প্রেক্ষিত ও সরকার কর্তৃক গৃহীত অনুকল্প, প্রণীত নীতির উদ্দেশ্য, নীতি সমন্বয়, নীতি বাস্তবায়ন কাঠামো ও ধারাবাহিকতা, কার্যক্রম পরিকল্পনা, নীতি-উৎপাদ, নীতি-ফলাফল ইত্যাদি পর্যালোচিত হয়েছে।

তবে সামগ্রিক নীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, আমাদের প্রশাসনিক উপরি কাঠামো যেমন, প্রণীত নীতি, গৃহীত পরিকল্পনা, বিধিবদ্ধ আইন (*Enacted Laws*), প্রশাসনিক স্তর-বিন্যাস ইত্যাদি দৃশ্যত চমৎকার হলেও এর ভেতর কাঠামো (*Inner Structures*) যেমন, অঙ্গীকার, বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, ও পদায়ন ইত্যাদির বাস্তব চিত্র খুবই নাজুক

(ইমাম ১৯৯৫:১১৮)। এ কারণে আমরা আমাদের অনেক পুরনো সমস্যা সমাধানে ক্রমাগত ব্যর্থ হয়েছি (Imam 1999:1)। বর্তমান পরিস্থিতি আরো জটিলাকার ধারণ করেছে, সমস্যা ক্রমাগত পুঞ্জিভূত হচ্ছে এবং এ সকল কারণে টিকে থাকার ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান এমন কি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নজিরবিহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। বিষয়টি আরো পরিস্কার ভাবে বলতে গেলে উদাহরণত বলতে হয়- বাংলাদেশের সংবিধানটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতর লিখিত সংবিধানগুলোর মধ্যে একটি। কিন্তু এত চমৎকার একটি সংবিধান আমাদেরকে প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সাম্য ও সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, মৌলিক মানবিক চাহিদা ও অধিকার পূরণ, সামাজিক নিরাপত্তা, সুশাসন- এ সবের কিছুরই নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। অপর দিকে জার্মানীর কোন লিখিত সংবিধান নেই। শুধুমাত্র মৌলিক আইনের (Basic Laws) একটি পুস্তিকার ওপর দাঁড়িয়ে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে কোন দেশের তুলনায় অধিকতর সুসংহত ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। উপর্যুক্ত মৌলিক বিষয়াবলী কার্যকরভাবে সম্বোধিত হয়েছে। গ্রেট বৃটেনের ও কোন লিখিত সংবিধান নেই। কেবল প্রচলিত প্রথা বা কনভেনশনের ওপর ভিত্তি করে দেশটি পরিচালিত হয় (রহমান, ১৯৯৯: ২৭)। অথচ তাদের শাসন ব্যবস্থার আওতায় মৌলিক আর্থ-সামাজিক চাহিদা ও অধিকারগুলো কি দারুণভাবে সম্বোধিত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, একটি চমৎকার নীতির অস্তিত্ব থাকাটাই শেষ কথা নয়, তবে কল্যাণ রাষ্ট্রের (*Welfare - State*) ক্ষেত্রে তা অবশ্যই একটি পূর্বশর্ত এবং এটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মধ্যেই সমাজের বিষয়াবলী পরিপূরিত হয়।

প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত এবং পরিবেশ প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের অনুকল্প

নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি দেশের জীব-জগৎ ও মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রতি যে ক্রমশ মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা সরকার যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছে। সরকার দেশের পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান প্রধান প্রতিক্রিয়া ও কারণসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সে আঙ্গিকে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নে প্রয়াস নিয়েছে। নীতিমালা প্রণয়নে চিহ্নিত বিরূপ পরিবেশ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে উপর্যুপরি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার আভাস, নদ-নদীতে লবণাক্ততার বিস্তার, ভূমিক্ষয়, দ্রুত বনাঞ্চল হ্রাস, জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিবর্তন ইত্যাদি। অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রধান সমস্যা হিসেবে নীতিমালায় জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা,

গণ-সচেতনতার অভাব ইত্যাদি বিষয়াবলী চিহ্নিত হয়েছে। পরিবেশ নীতির একটি বড় সবল দিক হচ্ছে পরিবেশ প্রশ্নে সরকারের বাস্তবানুগ অনুধাবন ও যথার্থ অনুকল্প গ্রহণ । এগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের সাথে বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সম্পদের ভিত্তি সরাসরিভাবে সম্পর্কিত বিধায় এ বিষয়ে সমন্বিত সতকর্তা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

(খ) বাংলাদেশের অবস্থান পরিবেশের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি এবং সম্পদ ব্যবহারে লাগসই প্রযুক্তি, টেকসই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অভাব একটি সমন্বিত ও অগ্রাধিকারভিত্তিক পরিবেশ নীতি গ্রহণের বিষয়টিকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

(গ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক । ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই তা নিশ্চিত করা যায়।

(ঘ) দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যাদির তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানকল্পে এ বিষয়টিকে দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার অবিভাজ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

(ঙ) দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব ও আবশ্যক।

এছাড়া নীতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আরো কতগুলো মাত্রা (*Dimensions*) জড়িত, যেগুলো যথার্থভাবে সম্বোধিত না হলে নীতি সমন্বয় কার্যকর হয়না। প্রথমত খাতভিত্তিক মাত্রা, যেখানে পরিবেশ সমস্যা নিরসনে খাত চিহ্নিতরকণসহ সমন্বয়ের দিকগুলো বিবেচনায় আনা হয়। দ্বিতীয়ত ইস্যু- মাত্রা, যেখানে বিশেষ ইস্যু গুরুত্ব সহকারে সম্বোধনের প্রয়াস নেয়া হয়। তৃতীয়ত স্থান ও সময় মাত্রা যেখানে অর্থনৈতিক. ও সামাজিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বিষয়কে কালিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজন হয়। চতুর্থত প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা, যেখানে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস নেয়া হয়। পঞ্চমত

কর্ম-কৌশল (*Toolkit*) মাত্রা, যেখানে সমন্বয় সাধনে প্রয়োজনীয় কর্ম-কৌশল উন্নয়নের প্রয়াস নেয়া হয়। নিম্নে এ বিষয়গুলো পরিবেশ নীতির আলোকে পর্যালোচিত হলো।

খাতভিত্তিক মাত্রা

ব্যবস্থাপনার দিক থেকে প্রণীত নীতিতে পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে ১৫টি খাতে ভাগ করা হয়েছে এবং নীতি বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনায় এ সকল খাতের বিদ্যামান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণসহ সমস্যা উত্তরণে করণীয় বিষয়াদি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৫ সালে প্রণীত জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনায় বিশেষভাবে ১২টি খাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেখানে সংশ্লিষ্ট খাতের বিদ্যমান সমস্যার আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরামর্শিত হয়েছে এবং এগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংগঠন ও জনগণের অংশগ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।

ইস্যু-মাত্রা

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় কোন কোন বিশেষ ইস্যু কখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সকল ইস্যুভিত্তিক সমস্যা সম্বোধনে তখন প্রণীত নীতির আলোকে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হয়। পরিবেশ নীতির আলোক প্রণীত জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনায় জলবায়ুর পরিবর্তন ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নগরায়ন, আঞ্চলিক নদীর পানি ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণা ও উন্নয়নকে বিশেষ ইস্যু হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নব্বুইয়ের দশকের গোড়ার দিকে দেশের বনসম্পদের অপ্রতুলতা, ব্যাপক বনোজাড় এবং এগুলোর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া রোধে বৃক্ষ রোপণের বিষয়টি একটি জাতীয় উপর্যুক্ত অনুকল্পসমূহ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের অনুধাবন যথার্থ বাস্তবসম্মত এবং এর পরিধিও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

নীতির উদ্দেশ্যসমূহ

পরিবেশ নীতিতে ৬টি উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্যগুলোতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন, সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড চিহ্নিতরণ ও নিয়ন্ত্রণ, সকল ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই ও

পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান, দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ দিকে থেকে বলা যায় যে, নীতিতে সন্নিবিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত।

নীতি সমন্বয়

সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ বিচারে নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত নীতি-সিদ্ধান্তসমূহ প্রণীত উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ব্যষ্টিক পর্যায়ে প্রণীত নীতি-সিদ্ধান্তসমূহের সাথে বাস্তবসম্মতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবচেয়ে বড় কথা, প্রণীত নীতি সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহীত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব। সামগ্রিকভাবে নীতি-সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তব সমস্যা সম্বোধনে উপযোগী। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যতগুলো উৎকৃষ্ট মানের নীতি-দলিল তৈরী হয়েছে, পরিবেশ নীতি তার মধ্যে একটি অনন্য দলিল। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এটিই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ দলিল, যা পরিবেশের সামগ্রিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করে । প্রণীত নীতিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এর সামগ্রিক নীতি-কাঠামো (*Overall Policy Structures),* সামষ্টিক পরিসর, ব্যষ্টিক স্তরের সুনির্দিষ্টতা, খাতভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণে যথার্থতা, সুসংহত আইনগত কাঠামো তৈরী, নীতি বাস্তবায়নে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি, খাতভিত্তিক সমস্যা সম্বোধন একটি কার্যক্রম পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তকরণ, যেখানে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের দায়িত্বাবলী স্থির করে দেয়া হয়েছে। এ সকল দৃষ্টিকোণ বিচারে প্রণীত নীতিটি কাঠামোগত দিক থেকে চমৎকার ভাবে সমন্বিত। গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে। অবশ্য আশির দশকের মধ্যভাগে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোর মরুময়তা রোধে সামাজিক বনায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

স্থান ও সময় মাত্রা

নীতি সমন্বয়ের দৃষ্টিকোণে স্থান ও সময় মাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কালিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশগত দিক থেকে কোন কোন এলাকা অপেক্ষাকৃত বিপন্ন বলে বিবেচিত হতে পারে (Liberatore 1997: 116)। এ দৃষ্টিকোণে জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনায় চর এলাকা, মধুপুর গড়, বরেন্দ্র ভূমি, জলাভূমি, পাহাড়কাটা, লবণাক্ততা ও চিংড়ি চাষ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশকে অপেক্ষাকৃত বেশী বিপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিবেশ নীতির আওতায় এ সকল এলাকার স্থানীয় সমস্যা সম্বোধনে সুনির্দিষ্ট

কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কালিক প্রেক্ষাপটে সুন্দর বনের বাস্তব্যরীতি (*Eco-Systems*) সংরক্ষণ এখন অত্যন্ত গুরুত্ববহ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলো এখন আঞ্চলিক পর্যায়ে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুর্ভূত হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা

যে কোন জননীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠোমো থাকা অপরিহার্য। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রচলিত আইন ও বিধানবলী ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের মূল দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তর ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু এ দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কারিগরি লোকবলের অভাব রয়েছে। নীতি বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে এখন পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। বিভাগীয় পর্যায়ে গঠিত পরিবেশ কমিটিগুলো সক্রিয় নয়। নীতি বাস্তবায়নে চিহ্নিত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত বিষয়াদি যথাযথভাবে সম্বোধিত হওয়ার বিধান থাকলেও তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ সেলটিকে এখনো কার্যকরভাবে সম্প্রসারণ করা যায়নি। বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা রয়েছে এবং বিভিন্ন আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে এখনো যথাযথ কাঠামো গড়ে ওঠেনি (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ : ৩০)। এ সমস্ত কারণে প্রণীত নীতির যথাযথ সুফল প্রাপ্তি বিলম্বিত হচ্ছে।

কর্ম-কৌশল মাত্রা

অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও অর্থনৈতিক কলা-কৌশল পরিবেশ নীতির কলা-কৌশলের (*Environmental Policy Instruments*) ওপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫:১১৮)। ফলে নীতি বাস্তবায়নে আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে সামগ্রিক নীতি-কর্ম-কৌশলসমূহের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন রয়েছে। পরিবেশ নীতিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হলেও দায়িত্ব পালনে কর্তৃত্ব (*Authority Instruments*) সম্প্রসারণের অভাব রয়েছে। পরিবেশ নীতির কর্ম-কৌশলের সাথে এখন পর্যন্ত প্রণোদনা কৌশল (*Incentive Instruments*) যেমন, অর্থনৈতিক কলা-কৌশল, স্বেচ্ছা-সমঝোতা (*Voluntary Agreements*), দক্ষতা কৌশল (*Capacity Instruments*) যেমন, তথ্য, শিক্ষা ও গবেষণা

ইত্যাদি যথাযথভাবে সংযোজিত হয়নি। নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রেও কার্যকর পদ্ধতির অভাব রয়েছে।

নীতি বাস্তবায়ন ও ধারাবাহিকতা

কাঠামোগত দিক থেকে নীতি বাস্তবায়নের বিষয়টি কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। প্রথমত পরিবেশ নীতির বাস্তবায়ন কাঠামোর মধ্যে নীতির সাথে সংযোজিত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা একটি কার্যকর দিক-নির্দেশনা হিসাবে কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়ত আইনগত কাঠামোর আওতায় পরিবেশ নীতিতে পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত সকল বর্তমান আইন সময়োপযোগী করে সংশোধনের বিধান রাখা হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন, আইনের বিধানসমূহ প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় গণ-সচেতনতা সৃষ্টিসহ আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে বিদ্যমান আইন , কনভেনশন ও প্রটোকলসমূহ সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য দিক- নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয়ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় নীতিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নীতি বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার/গুরুত্ব বিবেচনায় এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত বিবেচনায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের বিধানসহ পরিবেশ অধিদপ্তরকে গৃহীতব্য উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment বা EIA) পর্যালোচনা ও অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল দিক বিচারে প্রণীত নীতির বাস্তবায়ন কাঠামো অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসংহত । পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত জটিল ও বহুমুখী। এখানে পরিবেশকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের দেশে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে এ প্রবণতাটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। তাই নীতি বাস্তবায়ন কাঠামো যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও প্রকৃত বিচারে তার বাস্তব ফলাফল খুব আশাব্যঞ্জক নয়। অবশ্য এটা শুধু একক ভাবে পরিবেশ নীতির সমস্যা নয়।

অন্যদিকে নীতি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতার দৃষ্টিকোণে ১৯৯২ সালে নীতিটি প্রণীত হওয়ার পরপরই জাতীয় পরিবেশ পরিষদ ও জাতীয় পরিবেশ নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। যদিও ব্যাপক বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠান দুটির কার্যক্রম কালে-ভদ্রে দুএকটি সভা-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমিত থেকেছে (Huq and Haque, 1997:2-3), তথাপি নীতি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় এটি

নীতিটির একটি অন্যতম সাফল্য। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহ সময়োপযোগী করে সংশোধনের কোন প্রয়াস নেয়া না হলেও অনুভূত প্রয়োজনের আলোকে কিছু নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। বিস্তারিত পরিসরে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যকম পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। পরিবেশ সম্পর্কে আমরা আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী সোচ্চার ও সচেতন। এ বিষয়ে আন্ত র্জাতিক পরিমন্ডলে গৃহীত পদক্ষেপের সাথে বাংলাদেশ সরকারের সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া আশাব্যঞ্জক। নীতি বাস্তাবায়নে পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ওপর নির্ভরশীল। পরিকল্পনা মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না, এখন পর্যন্ত সে ব্যাপারে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধান বা পরিবীক্ষণ, এমনকি দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারেরও অভাব রয়েছে। গৃহীত সকল কার্যক্রমের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে বাস্তব কোন সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রণীত খাতভিত্তিক পরিকল্পনাসহ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াবলী অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে প্রণীত জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনাও এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অগ্রগতি হিসাবে বিবেচিত। এ সকল দিক বিচারে পরিবেশ নীতির বাস্তবায়ন কাঠামো যথেষ্ট শক্তিশালী হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তবে ধারাবাহিকতার দৃষ্টিকোণে নীতি বাস্তবায়নের দিকগুলো অধিকতর জোরদার করার অবকাশ রয়েছে।

কার্যক্রম পরিকল্পনা

প্রণীত নীতিমালার সাথে সংযোজিত কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং নীতিমালার আলোকে ১৯৯৫ সালে প্রণীত জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনার (নেমাপ) বেশ কিছু বিষয় ইতোমধ্যেই পর্যালোচিত হয়েছে। নেমাপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে এর অংশীদারিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি (*Participatory Approach*)। পরিবেশ নীতি যেহেতু অর্থনীতির সকল সেক্টরের কার্যক্রমকে স্পর্শ করে, সে কারণে সুষ্ঠু নীতি বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিকল্পনায় বহুবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির (*Multidisciplinary Approach*) প্রতিফলন ঘটানো অত্যাবশ্যক (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ : ১৩)। নেমাপে সমাজের বিভিন্ন স্ত রের জনগণ ও সংগঠনের পরিবেশ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ব্যষ্টিক বিশ্লেষণ

বাস্তবত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সরকারের ক্ষমতা সুদৃঢ়করণের কায়েমী স্বার্থ জড়িত থাকে (Richardson 1997 : 55)। বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ জাতীয় সমস্যার উদ্ভব না ঘটলেও নীতি বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন অবয়বে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিম্নে পরিবেশ নীতির খাতভিত্তিক নীতি-সিদ্ধান্ত সমূহ পর্যালোচিত হলো।

কৃষি

নীতিতে কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি পরিবেশসম্মতকরণের বিধান থাকলেও বাস্তবত তা কার্যকর হচ্ছেনা। কৃষি ক্ষেত্রে কৃষির জৈবগুণ বৃদ্ধি, উর্বরতা সংরক্ষণ ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য একটি মাঠভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা পরিচালনার কথা থাকলেও অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। রাসায়নিক বালাই ও কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণে জরুরীভিত্তিতে পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনা করা, প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, অগ্রাধিকারভিত্তিক একটি পরিবেশসম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন দারুণভাবে উপেক্ষিত। পরিবেশ সম্পর্কিত বর্তমান আইনসমূহ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনীর কথা থাকলেও এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। নীতিতে সকল কৃষি সম্পদের ভিত্তি সংরক্ষণের বিধান থাকলেও কার্যত তা প্রতিফলিত হয়না। উদাহরণত বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূমির বন্ধুরতা, মাটির গঠন বৈশিষ্ট ও বিরসতা এবং সর্বোপরি বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা এ অঞ্চলকে নিবিড় শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেনা। তথাপি, জনসংখ্যার চাপে বনোজাড়ের মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলে ব্যাপক কৃষি সম্প্রসারণ এ অঞ্চলকে অনিবার্য পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার এবং অবৈজ্ঞানিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাই এ বিপর্যয়ের মূল কারণ। পরিবেশসম্মত প্রাকৃতিক তন্তু

ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণের বিধান থাকলেও কৃত্রিম তন্তু যেমন, পলিথিনে বাজার ছেয়ে গেছে।

শিল্প

প্রণীত পরিবেশ নীতিতে ইতোপূর্বে স্থাপিত দূষণসৃষ্টিকারী শিল্পস্থাপনাসমূহে পর্যায়ক্রমে সংশোধনমূলক ব্যবস্থাগ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিল্পপতিরা তাদের আর্থিক সঙ্গতিহীনতার দোহাই তুলে সরকারকেই জনস্বার্থে সরকারি অর্থে একাজ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে এবং অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সরকার শিল্পপতিদের চাপে সেটা গ্রহণ করেছে। অথচ এ ক্ষেত্রে "*Polluter pays*" নীতি অনুসৃত হওয়ার কথা (Liberatore, 1997:108)। স্থাপিত শিল্পসমূহে দূষণ পরিশোধন স্থাপনার অভাব রয়েছে। শিল্পপতিদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার অভাব অত্যন্ত তীব্র। শিল্পস্থাপন এলাকা চিহ্নিতকরণে নীতিমালার অভাব রয়েছে। এসকল কারণে প্রণীত পরিবেশ আইন জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ : ৩৭)। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে নীতি বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পয়ঃ ব্যবস্থাপনা

নীতি জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর সকল প্রকার কর্মকান্ড প্রতিরোধকরণ, স্বাস্থ্যনীতিতে পরিবেশ বিবেচনা সম্পৃক্তকরণ, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ বিষয়ক কারিকুলাম অন্তর্ভুক্তিকরণ ইত্যাদির উপর জোর দেয়া হয়েছে। এগুলো রাতারাতিই অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই আশাব্যঞ্জক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

জ্বালানী

পরিবেশগত দিক থেকে দেশের জ্বালানী খাতের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। এ ব্যাপারে নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী খুবই সুসংহত। তবে এগুলো দ্রুত অর্জন করার সম্ভাবনা কম। জ্বালানী সঞ্চয়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবন এ মূহুর্তে সম্ভব নয়। জীবাশ্ম ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী সংরক্ষণের বিষয়টি অনেকাংশে অবহেলিত।

পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ

দেশের পানি সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার একেবারেই অনুপস্থিত। পানি উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম বিরূপ পরিবেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। উদাহরণত ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস, শুষ্ক মৌসুমে জোয়ারের স্তর হ্রাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপসমূহ পরিবেশসম্মত হয়নি। সকল উৎসের পানি সম্পদ দূষণমুক্ত রাখার কথা থাকলেও নীতিতে অন্তর্ভুক্ত এ বিধানাবলী আদৌ প্রতিপালিত হচ্ছে না।

ভূমি

এখন পর্যন্ত জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। ভূমিক্ষয় রোধ, লবণাক্ততা ও ক্ষারতা রোধ ও দেশের বাস্তব্যরীতি সাথে সঙ্গতি রেখে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়াবলী সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত।

বন, বন্যপ্রাণি ও জৈব-বৈচিত্র

দেশের বনসম্পদ সংরক্ষণ পরিস্থিতি নাজুক হলেও বনায়ন ও বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বন্যপ্রাণি ও জৈব-বৈচিত্র সংরক্ষণের বিষয়টি এখনো প্রথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

মৎস্য ও পশু সম্পদ

মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হলেও তা দেশের চাহিদার তুলনায় এখনো অপ্রতুল। নীতিতে জলাভূমি সংকোচন রোধ এবং পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ কার্যক্রমের মাধমে যাতে মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার বিধান থাকলেও কার্যত তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

খাদ্য

খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণে এখনো স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়নি। বিনষ্ট খাদ্যদ্রব্য পরিবেশসম্মতভাবে নিষ্পত্তিকরণ হয়না। পরিবেশ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী খাদ্যদ্রব্য আমদানী নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবত তা কার্যকর হচ্ছে না।

উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ

এক্ষেত্রে নীতিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী একেবারেই উপেক্ষিত হচ্ছে।

যোগাযোগ ও পরিবহন

নীতির আলোকে এ ক্ষেত্রে অনেক সমস্যাই চিহ্নিত হয়েছে এবং পরিকল্পনায় প্রযোজ্য কার্যক্রম পরামর্শিত হয়েছে। কিন্তু নদী ও সমুদ্র বন্দরসহ সামগ্রিক পরিবহন ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ দূষণ রোধে গৃহীত কার্যক্রম অত্যন্ত অপ্রতুল।

গৃহায়ন ও নগরায়ন

বস্তুত সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণেই এক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক নৈরাজ্য বিরাজ করছে।

জনসংখ্যা

বহুমুখী জটিলতার কারণে জনশক্তির সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে এক্ষেত্রে এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আশাব্যঞ্জক। উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হচ্ছে।

শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা

এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রম ও পদক্ষেপসমূহ খুবই আশাব্যঞ্জক। তবে অনেক ক্ষেত্রে এখনো লাগসই কার্যক্রম গ্রহণ ও দ্রুত দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অপ্রতুলতা রয়েছে। এ কারণে দেশে এখনো শক্তিশালী পরিবেশ বন্ধুসূলভ সুশীল সমাজ (Civil Society) গড়ে ওঠেনি।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা

যদিও দেশে পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অব্যাহত প্রয়াস চলছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলতাও অর্জিত হয়েছে, সামগ্রিকভাবে এ ক্ষেত্রের উন্নয়ন নিতান্ত ই অপ্রতুল। গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রণোদনার অভাব অত্যন্ত তীব্র এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবহারেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য লক্ষ্যণীয়।

নীতি মূল্যায়ন

পরিবেশ নীতি প্রণীত হওয়ার পর সুদীর্ঘ ৮-৯ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে দুটি রাজনৈতিক সরকারের পরিবর্তন এসেছে। সুতরাং নীতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি উপযুক্ত সময়।

নীতি হিসেবে পরিবেশ নীতির কোন কাঠামোগত সমস্যা নেই। বর্তমানে বিভিন্ন প্রেসার গ্রুপের মধ্যে পরিবেশ নীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সেক্টরে কী ধরনের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে যে সচেতনতা বিদ্যমান,

নীতি প্রণয়নকালে তা ছিল না। ফলে নীতি প্রণয়নকালে একদিকে যেমন সরকারকে বিভিন্ন প্রেসার গ্রুপের চাপের সম্মুখীন হতে হয়নি, অন্যদিকে নীতিটি যথার্থ গণমুখী হিসেবে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তন এবং সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও নীতিটি কোন অংশে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি অথবা নীতিটি পরিবর্তন-পরিমার্জন সংশোধনের আবশ্যকতা দেখা দেয়নি। নীতির উৎপাদ (*Policy Outputs*) হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা, জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এবং দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে পরিবেশের বিষয়াদি যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। নীতির ফলাফল (*Policy Outcomes*) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রণীত নীতির আলোকে গৃহীত কর্মসূচি জনগোষ্ঠি তথা সমাজের ওপর অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব রাখছে এবং নীতির উদ্দেশ্যসমূহও আশাব্যঞ্জক হারে অর্জিত হচ্ছে।

তবে একথা সত্য যে, খাতওয়ারী নীতি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে এখনো অনেক দুর্বলতা রয়েছে। পুরনো আইনগুলোতে এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিমার্জন-সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আন্তঃখাত ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের অভাব খুবই প্রকট। এ সকল সমস্যা উত্তরণে এখন পর্যন্ত লাগসই কর্মকৌশল উদ্ভাবনের বিশেষ কোন প্রয়াস নেয়া হয়নি। নীতি বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সক্ষমতা গড়ে ওঠেনি।

নীতি পরামর্শ ও উপসংহার

ক) প্রণীত নীতির আলোকে পুরানো আইনগুলোতে যথাসম্ভব দ্রুত প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

খ) নীতির আলোকে প্রণীত কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং আইনসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য জনগণের মধ্যে প্রণীত আইন ও সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সম্পর্কে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

গ) গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহের ক্ষেত্রে এবং আন্তঃখাত ও আন্তঃসংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় লাগসই কর্মকৌশলের উদ্ভাবন ঘটাতে হবে।

ঘ) নীতি বাস্তবায়নে কারিগরী জ্ঞানের অভাব দুর করতে হবে, জাতীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

ঙ) নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

সামগ্রিক বিচারে নীতি বিশ্লেষণের (*Policy Analysis*) দৃষ্টিকোণে বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি একটি সফল নীতি হিসেবে প্রতিভাত। নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চিহ্নিত দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলে নীতিটি বিশ্বের একটি অন্যতম সফল নীতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

ইমাম, কাজী হাসান (১৯৯৯) *পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত* ঢাকা প্যারাগন পাবলিশার্স।

ইমাম, কাজী হাসান. (১৯৯৫) পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন ও সম্পদ, বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক* ১৩৯৭, ঢাকা ঃ বিপিএটিসি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৫) *ন্যাশনাল এনভায়রণমেন্ট এ্যাকশন প্লান* (নেমাপ) ভলিয়্যুম-১বি, সার সংক্ষেপ, ঢাকা।

ভূইঞা, মোশারফ হোসাইন. (১৯৯৫) নীতি বিশ্লেষণ ঃ ধারণাগত কাঠামো। *লোক প্রশাসন সাময়িকী ৪র্থ সংখ্যাঃ* ঢাকা। বিপিএটিসি।

রেহমান, সোবহান, (১৯৯৯) দিনের পর দিন, *'যায়যায়দিন'* বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১১, ১৯৯৯, ঢাকা।

হোসেন ডঃ একরাম ও ইমাম, কাজী হাসান (১৯৯৮) বাংলাদেশের পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামো । ঢাকাঃ বিপিএটিসি।

Ahmed, Aftabuddin (1987) *Institutional Framework of Environmental Protection and Management for Training Seminar for Administrators in Bangladesh:* Dhaka: DPEC.

Baker, Susan. (1997) The Evolution of European Union Environmental policy : from growth to sustainable development? In *The Politics of Sustainable Development : Theory policy and practice within the European Union.* London and New York : Routledge.

Huq, Salemul and Haque, Mahfuzul. (1997) *Environmental planning in bangladesh : some experiences and lessons.* Paper presented in National Training Workshop on Sustainable Economic Modeling. Dhaka : ESCAP/BPATC

Imam, Kazi Hasan. (1999) *The Environment policy of Bangladesh.* A handout for the participants of Foundation Training Course. Dhaka : BPATC

Liberatore, Angela. (1997) The intergration of sustainable development objectives into EU Policy-making: barriers and prospects. In *The politics of sustaninable development. theory, policy and practice within the European Union.* London and New York. Routledge.

Richardson, Dick. (1997) The politics of sustainable Development. In *The politics of sustainable development : theory, policy and parctice within the European Union.* London and New York : Rutledge.

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
পঞ্চদশ সংখ্যা,
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের*

Land Management System of Bangladesh. Mohammad Abdul Qader

Abstract: This article attempts to evaluate the land management system of Bangladesh. Almost 80% people of Bangladesh live in rural areas and 70% people depends upon land. So making the land management system effective a good number of laws and rules should have to be published. But during the British period rules and regulations on effective land management system was totally absent. After emergence of Pakistan, The State Acquisition and Tenancy Act 1950 has been introduced for abolishing the rule of Zaminders and to establish government control upon the tenants. So the Board of Revenue has formulated "The Government Estates Manual –1958". The entire land management system of Pakistan period was totally directed by this Manual. After the independence of Bangladesh, people oriented land management system was highly needed. In this article land management process of Bangladesh has been discussed elaborately. Which registers should be maintained in the offices relating to the land management system and return procedure thereof, has been discussed in the article with due care. Accounts procedure and the deposit system has also been discussed exclusively in this article.

বাংলাদেশের মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় প্রায় বারো কোটি মানুষ বসবাস করে। অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় গড়ে প্রায় ৮০০ জন মানুষ বসবাস করে। শহরগুলিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব কোন কোন এলাকায় ৫০০০ জনের বেশী হলেও বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে এখনও ৮০% লোকের বসবাস। বর্তমানে এদেশের মানুষের পেশাগত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলেও এখনও মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৭% লোক কৃষির উপরই নির্ভরশীল । ভূমির উপরে এরূপ নির্ভরশীলতার কারণে ভূমি ব্যবস্থাপনা তথা ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিবিধান সম্বন্ধে প্রতিটি নাগরিকের সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ভূমি মালিকানার ধারণা বিকশিত হতে থাকে। আদিম সমাজে মানুষ বনে চড়ে বেড়াত, গাছের ফলমূল খেত এবং বন্য পশুপাখী শিকার করে জীবনধারণ করতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবন যাত্রায় পর্যায়ক্রমে জটিলতা দেখা দেয়। মানুষ তখন চাষ উপযোগী জমির সন্ধান শুরু করে। নদী তীরবর্তী উর্বর ভূমি এবং বৃক্ষরাজিতে পরির্পূণ ভূমির প্রতি তারা আকৃষ্ট হতে থাকে। গৃহপালিত পশু পালনের জন্য চারণ ভূমি হিসাবে সবুজ শ্যামলিমায় ঢাকা ভূমির প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

---

* উপ পরিচালক, বিপিএটিসি।

আর এজন্যই ভূমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য শুরু হয় মানুষের প্রচেষ্টা । সংগত কারণেই ভূমি বন্টন এবং ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন এসে যায়। অতীত কালে ভূমির যথাযথ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সার্ভে ও সেটেলমেন্টের মাধ্যমে ভূমি বন্টন প্রক্রিয়ার ইতিহাস তেমন জোড়ালো ভাবে পাওয়া যায় না। এজন্য আমরা এটুকু অন্তত ধারণা করতে পারি যে, জমির মালিকানা মূলতঃ জমির দখল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জমি দখল করে যিনি জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিকে চাষোপযোগী করে জমি চাষ করে উৎপাদন করতেন তিনি রাজাকে উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ প্রদান করে জমির দখলীস্বত্ব ভোগ করতেন। গোষ্ঠিগতভাবে বা সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাসের তাগিদে গ্রাম ব্যবস্থা বিকশিত হবার পরে গ্রাম প্রধান বা পঞ্চায়েতকে গ্রামের শান্তিশৃখলা রক্ষার জন্য চাষীরা উৎপন্ন ফসল থেকে একটি অংশ দিতে শুরু করে এবং তার মাধ্যমেই রাজার প্রাপ্য অংশ প্রদান করতে থাকে। যেসব পরিবার বেশী এলাকার জঙ্গল পরিষ্কার করে অনেক আবাদী জমি সৃষ্টি করতে পেরেছিল তারা তা পত্তন দেয়া শুরু করে। এভাবে জমির প্রজাপত্তনী প্রথার উন্মেষ ঘটে।

মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমনের পরে তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বেশ কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন আনলেও স্থানীয় রীতি নীতি অনুযায়ী স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে। সমগ্র ভারতবর্ষে ভূমি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার আনার লক্ষ্যে আলাউদ্দীন খিলজী ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মচারীদের ক্ষমতা খর্ব করনে। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মচারীদের বিলাসবহুল জীবন যাপন তথা দুর্নীতি বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা যাচাই করার লক্ষ্যে জমি জরিপ করে জমির উৎপন্ন ফসলের সর্বোচ্চ এক চতুর্থাংশ খাজনা ধার্যের ব্যবস্থা করেন। খরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে চাষীদের কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ ঋণ হিসাবে "তাকাভী ঋণ" প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর শাসন ব্যবস্থার কিছুটা ছোঁয়া বাংলাদেশেও এসে লাগে। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার এনে তা যুগোপযোগী করার জোড়ালো প্রচেষ্টা শুরু হয় মূলত সম্রাট শেরশাহের আমলে। তাঁর আমলে চাষোপযোগী ভূমিকে আইনানুগ স্বীকৃতি দেয়ার লক্ষ্যে পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রবর্তন করা হয়। পাট্টা হলো সরকার বা জমিদার কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে জমি ভোগ দখল করার অধিকারপত্র, যাতে জমির পরিচিতি, মূলতঃ জমির বর্ণনা অর্থাৎ জমির চৌহদ্দি, পরিমাণ, খাজনার পরিমাণ, চাষীর অধিকার সম্বলিত শর্তাবলীর উল্লেখ

থাকতো। আর কবুলিয়াত হলো এক ধরনের দলিল যা সরকার বা জমিদারের নিকট হতে লিখিত পাট্টা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রজা পাট্টায় প্রদত্ত শর্তসমূহ গ্রহণ করে কবুলিয়ত বা সম্মতি প্রদান করতেন। এই সম্মতি পত্রই মূলতঃ কবুলিয়ত নামে পরিচিত। কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথার মাধ্যমে চাষী ভূমির উপর মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি লাভ করে এবং আদালত কর্তৃক ভূমি মালিকানা ও দখল সংক্রান্ত রায় পাওয়া সহজতর হয়। এ সময়ে আবাদী জমি সরজমিনে জরিপ করে ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আমিন এবং কানুনগো নিয়োগ করা হয়। মূলতঃ ভূমি জরিপের লক্ষ্যে নক্‌শা প্রস্তুত করে খানা পুরনের কাজ করা হয়। কানুনগো খানাপুরি রেকর্ডের সময় মালিকদের নিকট সরজমিনে গিয়ে বুঝানোর (বুঝারত) কাজ করতেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা নিতেন। মুঘল শাসনামলে শায়েস্তাখান, মীর জুমলা, মুর্শিদকুলি খাঁন প্রমুখ শাসকবর্গ বাংলাদেশের আবাদী জমির নক্‌শা ও রেকর্ড প্রস্তুত করার জন্য যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। সে সময়ে সমগ্র বাংলাদেশ অর্থাৎ সুবে বাংলাকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে তার অধীনে পরগনা ও মহাল সৃষ্টি করা হয়। প্রাদেশিক পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দেওয়ান এবং তার নিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ বিভাগীয় পর্যায়ে আমল গুজার বা আমি (কালেক্টর) এবং পরগনা পর্যায়ে শিকদার রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করতেন। তাছাড়াও কানুনগো, পটোয়ারী ও আমীন নিয়োগ করা হতো। একদিকে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া উন্নতকরণ অপরদিকে বন্যা ও খরার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কৃষকদের পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তাকাভী ঋণের ব্যবস্থা করার ফলে কৃষি উৎপাদন পর্যাপ্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিংবদন্তী আছে যে, শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত।

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার ভাগ্য বিপর্যয়ের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে থাকে। সে সময়ে শাসকবর্গ দেখতে পান যে তাদের রাজস্ব আয়ের মূল উৎস হলো ভূমি রাজস্ব। বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমকে পরাজিত করে নিরংকুশভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা সালামীর বিনিময়ে দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। প্রথম দিকে তারা মোহাম্মদ রেজা খানকে নায়েবে দেওয়ান নিযুক্ত করে প্রচলিত রীতিনীতি মোতাবেক ভূমি রাজস্ব আদায় এবং ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক ভাবে চালাতে থাকে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদের এদেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার সুযোগে

এদেশের রায়তগণ ভূমি রাজস্ব আদায় এবং কোম্পানীকে প্রদানের ক্ষেত্রে কারচুপি এবং তহবিল তছরুপের ঘটনা ঘটায়। অন্যদিকে বাংলা ১১৭৬ সনে (১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলায় মারাত্মক এক মনন্তর হয় যাতে বাংলার প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। ফলে রাজস্ব আদায়ে ব্যাপকভাবে ভাটা পড়ে। মূলতঃ মুনাফা লাভ করা ছিল বৃটিশদের মূল লক্ষ্য সেজন্য তারা এদেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ দেওয়ানী পরিচালনার ভার সরাসরিভাবে গ্রহণ করে। ভূমি রাজস্ব আদায় জোরদার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রকৃতি জোরালো করার লক্ষ্যে নায়েবে দেওয়ান রেজা খানকে অপসারণ করে প্রতিটি পরগনায় একজন রেভিনিউ সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৯৭২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথম গর্ভনর নিযুক্ত হয়ে ভূমি রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার জন্য সুপারভাইজারের স্থলে রেভিনিউ কালেক্টর নিয়োগ করেন।

এদিকে নিলামের মাধ্যমে প্রথম ১ সালা ও পরে ৫ সালা এবং লর্ড কর্নওয়ালীসের আমলে ১০ সালা বন্দোবস্তি প্রথা চালু করা হয়। কিন্তু এসব বন্দোবস্ত প্রদানের ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন পরিবর্তন না আসায় ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রস্তাবিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্রিটিশরা একটি নির্দিষ্ট এলাকার জমি নির্ধারিত খাজনার বিনিময়ে এলাকার বিত্তবানদের নিকট চিরদিনের জন্য মালিকানাস্বত্ব প্রদানের ব্যবস্থা নেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কৃষকরা আবহমানকালের স্বত্ব হারিয়ে ফলে। এভাবে জমিদারী ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে আরও জোরালো হতে থাকে এবং প্রজাদের উপর নিপীড়ন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ব্যবস্থায় কৃষকদের দখলীয় জমি নির্দিষ্ট খাজনা দিয়ে ভোগ দখলের সুযোগ রাখা হয়। জমিদারী এলাকার বহির্ভূত জমি বন্দোবস্ত দেয়া এবং খাজনা আদায়ের জন্য কালেক্টরেটে খাস মহল নামে একটি শাখা খোলা হয়। ভূমি রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেশকিছু নির্বতনমূলক আইনও প্রণয়ন করা হয়। সূর্যাস্ত আইন, রেন্ট এ্যাক্ট, রেন্ট কমিশন, ফ্লাউড কমিশন প্রভৃতি আইন প্রণয়ন ও কমিশন গঠন করা হয়। রাজস্ব বাবদ আয় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য প্রতি বৎসরের ৩০শে চৈত্র তারিখের মধ্যে নির্ধারিত বার্ষিক রাজস্ব কোন জমিদার পরিশোধ করতে না পারলে ৩০শে চৈত্র সূর্যাস্ত পরে সংশ্লিষ্ট জমিদারী রাজস্ব বকেয়া দায়ে নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত এই আইনের ফলে জমিদারেরা প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের জন্য নানাভাবে উৎপীড়ন বৃদ্ধি করে এবং তাদের

নিকট থেকে খাজনা আদায় করে কোম্পানীর রাজস্ব পরিশোধের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বৃটিশ আমলে মূলতঃ যেসব আইন প্রণীত হয়েছিল তা নির্বতনমূলক হওয়ায় ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। অর্থাৎ বৃটিশ আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য যেরূপ আইন বা বিধিবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল তদরূপ আইন বা বিধিবিধান প্রণীত হয়নি। বৃটিশ আমলে মুলতঃ ইংরেজ শাসকবর্গ এদেশকে তথা এদেশের মানুষকে শোষণ করার মানসে নিবর্তনমূলক আইন কার্যকরী করার জন্য চেষ্টিত ছিল বিধায় সেই সময় তারা ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য তেমন কোন আইন বা বিধি প্রণয়ন করেনি।

বৃটিশ শাসনের অবসানের পরে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ প্রণয়ন করে যাবতীয় মধ্যস্বত্ব বিলুপ্ত করে রায়তগণকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে আনায়ন করা এবং ভূমিতে রায়তের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সকলের ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা নেয়া হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল ও জমিদারী অধিগ্রহণের ফলশ্রুতিতে জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার উপযোগী প্রশাসনিক অবকাঠামো সৃষ্টি ও নীতিমালা জারীর লক্ষ্যে তৎকালীন রাজস্ব রোর্ড “The Government Estates Manual, 1958” প্রণয়ন করে। জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং রায়তগণ হতে খাজনা আদায়ই সরকারের প্রধান দায়িত্বে পরিণত হয় ফলে জমির খাজনা ধার্যকরণ এবং আদায়ের কর্ম সম্পাদানের মাধ্যমে জেলা কালেক্টরগণ কার্যতঃ জমিদারগণের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভূমি ব্যবস্থাপনা জনকল্যাণমূখী করে তোলার লক্ষ্যে বেশ কিছু আইন ও বিধি প্রণীত হয়েছে। যেমনঃ

(ক) খাস জমিতে ছিন্নমূল ও বাস্তুহীন পরিবারসমূহকে পূণর্বাসনের লক্ষ্যে গুচ্ছ গ্রাম/ আশ্রায়ন প্রকল্প সৃজনের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন।
(খ) ১৯৭৬ সালের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ জারী।
(গ) ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ - ১৯৮৪ প্রণয়ন।
(ঘ) ঋণ সালিসী আইন- ১৯৮৯ প্রণয়ন।
(ঙ) ঋণ সালিসী বোর্ড গঠন।

(চ) মহামান্য রাষ্টপতির সভাপতিত্বে জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিষদের গঠন।
(ছ) ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন।
(জ) ভূমি আপীল বোর্ড গঠন।
(ঝ) জেলা ভূমি সংস্কার টাস্কফোর্স গঠন।
(ঞ) উপজেলা পর্যায়ে ভূমি সংস্কার কমিটি গঠন।

উপরোক্ত বিভিন্ন বিধি বিধান প্রণয়ন ও কমিটি গঠনের মাধ্যমে সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। এই লক্ষ্যেকে সামনে রেখে The Government Estates Manual, 1958 এর পরির্বতে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ম্যানুয়াল অনুযায়ী বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সাংগঠনিক স্তরসমূহ

ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বিষয়টিতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিবাহী অর্থাৎ রাষ্টপতিকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করে "জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিষদ" সৃষ্টির কথা ম্যানুয়াল এর প্রথমদিকে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসনব্যস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উক্ত পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়াবলী বিশদভাবে পর্যালোচনার জন্য "জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিষদ স্থায়ী কমিটি" গঠন করে সামগ্রিকভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত মাঠপর্যায়ের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন মনিটরিং এর লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই বোর্ড সরকার কর্তৃক অর্পিত ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করে, প্রয়োজনে কোন আইনের দ্বারা বা অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে।

ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের বিধান অনুসারে বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল/রিভিশন দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ভূমি প্রশাসন বোর্ড বিলুপ্ত করে একটি সার্বক্ষণিক ভূমি আপীল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ভূমি আইন সংক্রান্ত সমুদয় আপীল নিষ্পত্তির জন্য এটাই সর্বোচ্চ

প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল। এই বোর্ডের রায় বিভাগীয় কমিশনার, জেলা কালেক্টর ও তার অধীনস্থ সকল কর্মকর্তার উপরে বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে।

জেলা পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ও দায়িত্ব জেলা কালেক্টরের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। জেলা প্রশাসকের এই দায়িত্বাবলীর তদারকী ও যথাযথ কার্যকরতার সার্বিক নির্দেশনায় থেকে একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কাজ করেন।

জেলা কালেক্টর বিশেষতঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সার্বিক নিদের্শনায় ও তত্ত্বাবধানে থেকে একজন রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) কাজ করেন। তিনি মূলতঃ জেলায় কর্মরত সকল অধস্তন ভূমি ব্যবস্থাপনা অফিসারদের কাজ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন, ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ধার্যকরণ ও আদায় তাঁর প্রত্যক্ষ কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম।

উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে (১৯৮২ ইং এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী) সাবেক মহকুমা প্রশাসক ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যে সব সার্বিক দায়িত্ব পালন করতেন তা ইউএনওগণের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এদিকে উপজেলা পর্যায়ে নিকার অনুমোদিত জোনাল জরিপ ব্যবস্থায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নেতৃত্বে জরিপ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত অবকাঠামোর প্রবর্তন করা হয়েছে। জরিপের মাধ্যমে প্রণীত রেকর্ড চূড়ান্তকরণের পরে তদনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় এবং পুনরায় জরিপ না হওয়া পর্যন্ত তা সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস গ্রহণ করবে।

তহশীল অফিস নাম পরিবর্তন করে প্রতি ইউনিয়ন একটি ইউনিয়ন ভূমি অফিস স্থাপন করে চিরাচরিত প্রথায় খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এখন থেকে এই ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলি ভূমি সংস্কারসহ সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করে সব ধরনের কার্যক্রমকে যুগোপযোগীভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলি যথাযথ ভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

১৯৭৬ সালে ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ জারী করে সরকার জমির উপর থেকে সকল প্রকার খাজনা/সেস ইত্যাদি রহিত করে প্রত্যেক মালিক পরবিার/সংস্থার মালিকানাধীন মোট জমির ভিত্তিতে প্রগতিশীল হারে ভূমি উন্নয়ন কর প্রবর্তন করেছেন। এ লক্ষ্যে জমিকে কৃষি ও অকৃষি হিসাবে বিভক্ত করে পৃথক হারে কর ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অকৃষি জমিকে আবার শিল্প ও বাণিজ্যিক এবং আবাসিক ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার্য জমি হিসেবে শ্রেণী বিন্যস্ত করে কর ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিষয় তা হল, সাব পদ্ধতি অনুসরণ করে ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাস জমি ব্যতীত সকল শ্রেণীর ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও অন্যান্য সরকারী বিভাগের জমি ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কর আরোপযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহার্য কবরস্থান, শ্মশান ও উপাসনালয়কে ভূমি উন্নয়ন কর মুক্ত বলে ঘোষণা করতে পারবেন। কিন্তু পারিবারিক গোরস্থান বা উপাসনালয়ের ক্ষেত্রে এরূপ কর মুক্ত আদেশ দেয়া যাবে না।

তহশীলদার প্রত্যেক মালিক পরিবার বা সংস্থার জন্য প্রথমে মৌজাওয়ারী ও পরে ইউনিয়নওয়ারী (তহশীল এলাকা) একটি কৃষি জমির সাময়িক কর নির্ধারণী তালিকা প্রণয়ন করবেন। ইউনিয়ন ভূমি অফিসে রক্ষিত এক নম্বর ও দুই নম্বর রেজিষ্টার, রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৬/১৯৭২ এবং ৯৮/১৯৭২ মোতাবেক ইতোপূর্বে দাখিলকৃত জমির বিবরণের ভিত্তিতে প্রথমে প্রতিটি মৌজার প্রত্যেক মালিক পরিবার/সংস্থার মোট জমির পরিমাণ ও বিবরণ প্রণয়ন করে দুই নম্বর রেজিষ্টারে নিজ বাসস্থান মৌজায় তাহার নামীয় হোল্ডিং এর মন্তব্য কলামে লিপিবদ্ধ করতে হবে। মৌজাওয়ারী মালিক পরিবার/সংস্থার জমির বিবরণ প্রণীত হওয়ার পরে তা তুলনামূলক পর্যালোচনা করে এই ইউনিয়নওয়ারী তালিকার ২টি কপি প্রণয়ন করে ১টি কপি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে এবং অন্যকপি সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। ইউনিয়নওয়ারী ও উপজেলাওয়ারী কর নির্ধারণী তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তার এলাকার সার্বিক তদারকীর দায়িত্বে থাকবেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তার জেলাধীন সকল উপজেলাওয়ারী কর নির্ধারণী তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজ তদারকী করবেন।

খাস কৃষি জমির বন্দোবস্তি প্রক্রিয়া

কৃষি জমির সুষম বন্টনের মাধ্যমে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ একটি মৌলিক অঙ্গীকার। খাস জমি চিহ্নিত করে ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন চাষী পরিবারের মধ্যে খাস কৃষি জমি বিতরণ ও বাস্তুহারা পরিবারসমূহের মধ্যে বসতবাড়ী নির্মাণের জন্য অকৃষি জমি বন্টন ইত্যাদি জাতীয় ভূমি সংস্কার কার্যক্রমের প্রাথমিক স্তর হিসাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০ এর ৪১ নং বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিধি ৪২ এ খাসজমির সংজ্ঞা এবং উৎস সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর বন্দোবস্তিযোগ্য খাস কৃষি জমি যা কিনা ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনযোগ্য হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা ৪৩ নং বিধিতে দেয়া হয়েছে। খাসজমি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক তহশীলদার তার এলাকার মৌজাম্যাপ সরজমিনে পরীক্ষা করে নীতিমালায় বর্ণিত ছক-২ মোতাবেক সকল শ্রেণীর খাসজমির একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন। প্রতিটা মৌজার খাসজমির বিবরণসহ খাসজমি চিহ্নিত করে একটি স্কেচম্যাপ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট পাঠাতে হবে। এরই ভিত্তিতে খাসজমি বন্দোবস্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) উক্ত বিবরণী অফিস রেকর্ডের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে ও সত্যতা যাচাই করে সন্তুষ্ট হলে খাসজমি পৃথক করবেন। অতঃপর তিনি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করবেন ও তা ইউএনও কর্তৃক স্বাক্ষরের পর কালেক্টরের নিকট পাঠাবেন। তিনি আপত্তি (যদি থাকে) শুনবেন এবং নিশ্চিত হয়ে খাসজমি বন্দোবস্তি অনুমোদন করবেন।

খাসজমি কারো অবৈধ দখলে থাকলে, উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দখলমুক্ত করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহাকারী কমিশনার (ভূমি) জরুরী ভাবে মামলা সৃজন করবেন এবং জেলা কালেক্টরের অনুমোদনক্রমে আইন অনুযায়ী অবৈধ দখলকারীকে উচ্ছেদ করবেন। খাসজমি বন্দোবস্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শ্রেণীর পরিবারসমূহ ভূমিহীন পরিবার বলে গণ্য হবেঃ

(ক) যে পরিবারের বসত বাড়ী ও কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর।

(খ) যে পরিবারের বসতবাড়ী আছে, কিন্তু কৃষি জমি নাই অথচ পরিবারটি কৃষি নির্ভর , এবং

(গ) যে পরিবারের বসতবাড়ী ও কৃষি জমি উভয়ই আছে, কিন্তু মোট জমির পরিমাণ ০.৫০ একরের কম অথচ পরিবারটি কৃষি নির্ভর।

কৃষি নির্ভর বলতে ঐ পরিবারকে বুঝাবে যে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য কৃষি শ্রমিক হিসাবে নিজ বা অন্যের জমি চাষ করে। খাসজমি বন্দোবস্তি প্রদানের লক্ষ্যে দরখাস্ত আহবান পূর্বক দরখাস্ত বাছাই করে ভূমিহীনদের মধ্য হতে বন্দোবস্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাধিকার প্রদান করে তালিকা তৈরী করতে হবে। অতঃপর বিধি মোতাবেক সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বন্দোবস্তি প্রদানযোগ্যদের তালিকা কালেক্টরের নিকট পাঠিয়ে তা অনুমোদনের ব্যবস্থা নিবেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তা অনুমোদন করার পরে নির্ধারিত কবুলিয়াত গ্রহণ করতঃ রেজিষ্ট্রি করে জমি হস্তান্তর করবেন। এসব জমি পনের বছরের মধ্যে কেউ বিক্রি বা হস্তান্তর করলে বা স্বামীর, স্ত্রীর বিবাঁহ বিচ্ছেদ ঘটলে বন্দোবস্তি বাতিল হয়ে তা খাস হয়ে যাবে।

চর জমি বন্দোবস্তি প্রক্রিয়া

কোন জমি নদী বা সমুদ্র গর্ভে সিকস্তি হয়ে গেলে জমির মালিক বা তার উত্তরাধিকারীগণের ঐ জমিতে সবরকমের মালিকানা বা স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়ে যাবে। নদীগর্ভ বা সমুদ্রগর্ভ থেকে কারও মালিকানাধীন জমির সংলগ্ন কোন চর সৃষ্টি হলে তা মালিকের জমির পরিবৃদ্ধি বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ কোন চর জেগে উঠলে তা নিরংকুশভাবে সরকারের উপর বর্তাবে এবং সরকার প্রচলিত নিয়মনীতি অনুয়ায়ী বন্দোবস্তি দেবে। নবসৃষ্ট চরের জমি যেহেতু সম্পূর্ণভাবে সরকারের জমি সেহেতু তা বেআইনী দখলদারমুক্ত রাখা এবং জমি চাষের উপযোগী হওয়া মাত্রই তা দিয়ারা জরীপ করিয়ে রেকর্ডভুক্ত করানোর জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর বরাবরে অনুরোধ পত্র প্রেরণের দায়িত্ব জেলা কালেক্টর পালন করবেন। চর্চা ম্যাপের ভিত্তিতে জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবেনা। তবে নতুন চরের জমির জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত কালেক্টর বা রাজস্ব অফিসার (অর্থাৎ সহকারী কমিশনার ভূমি) একসনা বন্দোবস্তি দিতে পারবেন।

এরূপ চরজমি একসনা ভিত্তিতে বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট তহশীলদার ইউনিয়ন এলাকার খাস জমির একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা উপজেলা ভূমি সংস্কার কমিটির নিয়মিত সভায় অনুমোদন করিয়ে নিয়ে বন্দোবস্ত দিতে পারবেন। এজন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদা কাগজে দরখাস্ত আহবান করবেন ও ব্যাপক প্রচার করবেন। ৮৫ বিধি অনুয়ায়ী একসনা বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের আবেদন পাওয়ার পরে আবেদনগুলি উপজেলা ভূমি সংস্কার কমিটি বিবেচনা

করে প্রয়োজনে সাক্ষাতকার গ্রহণ করে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে একসনা বন্দোবস্তি দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করবে। অতঃপর সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রত্যেক বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য পৃথক কেস সৃজন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন এবং ইউএনও উক্ত বন্দোবস্ত অনুমোদন করবেন। এই ইজারা নবায়ন যোগ্য নয় বিধায় বিরোধ বা মামলা এড়ানোর জন্য একই ব্যক্তিকে বার বার ইজারা না দেয়া বাঞ্ছনীয়। এরূপ ক্ষেত্রে বার্ষিক ইজারা মূল্য একর প্রতি তিনশত টাকা।

এই ধরনের একসনা বন্দোবস্ত মূলত সাময়িক ভাবে জমি চাষ করার অনুমতি মাত্র। এর দ্বারা কোন মালিকানা, স্বত্বাধিকার বা দখল অধিকার সৃষ্টি হয় না। এমনকি ৬০ বৎসর কাল ব্যাপী জমিতে জবর দখল বা adverse possessional right এর মাধ্যমে মালিকানা প্রতিষ্ঠার যে বিধান রয়েছে তাও একসনা লিজ বা ডিসি আর মাধ্যমে দখলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর সংশোধিত ৮৫ ধারা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে বা পরে কোন সিকস্তি জমি, সিকস্তির ২০ বৎসরের মধ্যে পয়স্তি হলে সাবেক মালিক বা উত্তরাধীকারীগণকে উক্ত জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। তবে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপ প্রার্থীকে ভূমিহীনদের অগ্রাধীকার তালিকাভুক্ত হতে হবে।

অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত ও গুচ্ছ গ্রাম (আশ্রয়ন প্রকল্প) সৃজন

শহর বা পৌর এলাকার জমি কৃষি ও অকৃষি উভয় শ্রেণীর হতে পারে। অকৃষি জমি ১৮৮২ সালে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৯৪৯ সনের অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন এবং ১৯৫০ সনের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বিধান বলে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। জমিদারী অধিগ্রহণের পূর্বে যে সকল অকৃষি প্রজাস্বত্ব বিদ্যমান ছিল কেবলমাত্র ঐ সকল ক্ষেত্রে অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে। শহর বা পৌর এলাকার বাইরে অকৃষি জমির ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। পৌর এলাকার অকৃষি জমি বন্দোবস্তির সময় লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো হলোঃ

(ক) বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে এরূপ স্বত্বভোগের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে যাতে তিনি ইমারত নির্মাণ জাতীয় মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহিত হন।

(খ) ইজারা মূল্য এমন ভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে পার্শ্ববর্তী অনুরূপ সুযোগ সুবিধাপূর্ণ এলাকাস্থ জমির মূল্যের সমান হয়।

অকৃষি জমির লিজ নির্ধারিত ফরমে রেজিষ্ট্রিকৃত হতে হবে। লীজ দীর্ঘ মেয়াদী বা স্বল্প মেয়াদী হতে পারে। দুই ধরনের লিজের জন্য পৃথক ফরম ব্যবহার করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী লিজ সাধারণত ৩০ বৎসর মেয়াদী হবে যা ৯৯ বৎসর পর্যন্ত নবায়ন করা যাবে। স্বল্প মেয়াদী হোক বা দীর্ঘ মেয়াদী হোক লীজ গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই লীজকৃত জমি কারো নিকট হস্তান্তর বা সাবলীজ প্রদান করতে পারবেন না। আর স্বল্প মেয়াদী লীজ সাধারণত ৫ বৎসরের বেশী হবে না এবং লীজ গ্রহীতার লিজ নবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে। স্বল্প মেয়াদী লীজকৃত জমিতে কোন বাড়ী বা পাকা ইমারত নির্মাণ করা যাবে না। অন্যান্য ধরনের জমির ব্যবস্থাপনার ন্যায় এরূপ ক্ষেত্রেও তালিকা প্রকাশ, আপত্তি শ্রবণ ও নিষ্পত্তি, বন্দোবস্ত প্রদান, বন্দোবস্ত বাতিল, চূড়ান্ত আদেশ প্রদান, কবুলিয়াত ইত্যাদি প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে।

খাস জমিতে পুনর্বাসিত ভূমিহীনদের দখল বজায় রাখার প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রতিকূলতার মোকাবেলা, প্রাথমিক পুঁজি, উপকরণ সংগ্রহ ও সর্বোপরি মনোবল বৃদ্ধি ও দলগত চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে সমবায় সংগঠনের ভিত্তিতে বর্তমানে গুচ্ছগ্রাম/আশ্রয়ন প্রকল্প সৃজন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সরকার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা এ ধরনের আদর্শ গ্রামের বা আশ্রয়ন প্রকল্প এলাকার সদস্য হবেন তারা যাতে স্বাবলম্বী হয়ে স্ব স্ব পেশায় নিয়োজিত থেকে বেকারত্বের অভিশাপ মুক্ত একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন সে জন্যই মূলত গুচ্ছগ্রাম/আশ্রয়ন প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ ও সীমাতিরিক্ত জমি উদ্ধার

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ২০(২) এবং ৯০ ধারার বিধান মোতাবেক কোন ব্যক্তি ৩৭৫ বিঘার বেশী জমির মালিকানা অর্জন করতে পারবে না। বাংলাদেশ ল্যান্ড হোল্ডিং লিমিটেশন অর্ডার ১৯৭২ (অর্থাৎ পিও - ৯৮/১৯৭২) বলে এই সীমারেখা ১০০ বিঘায় কমিয়ে আনা হয়। আর ১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারী করে এই উর্ধ্বসীমা ৬০ বিঘায় নির্ধারণ করা হয়। তবে এই অধ্যাদেশ কার্যকরী হওয়ার আগে যারা ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির

মালিক ছিলেন তারা ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি রাখতে পারবেন। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমি সরকারের সম্পত্তি হবে। কোন পরিবার বা সংস্থা এই তারিখের পরে ১০০ বিঘার বেশী জমি ক্রয়, দান, উত্তরাধিকার বা অন্য কোন সূত্রে অর্জন করতে পারবে না। ১০০ বিঘার ঊর্ধ্বসীমা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তে শিথিল করা যেতে পারে ঃ

(ক) সমবায় সমিতির সদস্যবর্গ যদি তাদের জমির মালিকানা সমিতির অনুকূলে হস্তান্তর করে নিজেরা চাষাবাদ করেন।

(খ) চা, কফি, রাবার বা অন্য কোন ফলের বাগানের জন্য ব্যবহৃত জমি।

(গ) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের জমি।

(ঘ) অন্য কোন কাজের জন্য জনস্বার্থে সরকার প্রয়োজন মনে করেন এরূপ জমি।

ওয়াকফ, দেবোত্তর বা ট্রাষ্টের মালিকানাধীন জমির সম্পূর্ণ আয় ধর্মীয় বা দাতব্য কাজে ব্যবহৃত হলে এরূপ জমি ঊর্ধ্বসীমার আওতার বাহিরে রাখা যাবে । যাদের জমি ১০০ বিঘার, ঊর্ধ্বে তাদের সীমাতিরিক্ত জমি সরকারের নিকট সমর্পণ করার জন্য রাজস্ব অফিসার জমির মালিককে নির্দেশ দিবেন এবং প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করে সমর্পণযোগ্য জমি গ্রহণের আদেশ দিবেন। এ আদেশের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট আপীল করা যাবে। এই আইন বলবৎ হওয়ার পরে কোন পরিবার বা সংস্থা ১০০ বিঘার বেশী জমি উত্তরাধিকারী সূত্র ব্যতীত অর্জন করলে বা জমির বিবরণী দাখিলের পরে অর্জন করলে সীমাতিরিক্ত এই জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত/সমর্পিত হবে। এই সীমাতিরিক্ত জমি নির্ধারণ করে তার দখল গ্রহণ করার জন্য কালেক্টরগণ সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

ভূমি সংস্কার আইন ও বর্গাদার

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বর্গাদার ও ভূমি মালিক সম্পর্ক সুসংহত করার লক্ষ্যে ভূমি মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ এবং কৃষি জমি হস্তান্তর সম্পর্কিত ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ নামে একটি অধ্যাদেশ জারী হয়। এই আইন পরিপন্থি কোন বিধান অন্য আইনে থাকলেও এই আইনের বিধানই কার্যকরী হবে। আর এই আইন কার্যকারী হওয়ার পরে কোন মালিক/পরিবার ৬০ বিঘার

বেশী জমির মালিকানা কোন ভাবেই অর্জন করতে পারবেনা । এই ঊর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি অর্জন করলে তা সরকার ন্যস্ত হবে। কেবল মাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সীমাতিরিক্ত জমির জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে ।

কোন ব্যক্তি নিজের ভোগদখল তথা ব্যবহারের জন্য অন্যের নামে কোন সংস্থার সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবে না। যে ব্যক্তির নামে সম্পত্তি কেনা হবে তিনিই তার প্রকৃত মালিক বলে গণ্য হবেন। কোন জমি বেনামীতে কেনা হয়েছে বা ক্রেতা অন্যের সুবিধার জন্য জমি কিনেছেন এমর্মে আদালতে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে না।

গ্রামাঞ্চলে কোন ব্যক্তি তার মালিকানাধীন জমিতে বসবাস করলে তার বসত ভিটার জমি নিলাম বা অন্য কোন প্রকারে দায়বদ্ধ বহির্ভূত বলে গণ্য হবে এবং আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের আইনানুগ কার্যক্রমের এক্তিয়ার বহির্ভূত থাকবে। বসবাসকারী ব্যক্তিকে বাস্তুভিটা হতে কোন ক্রমেই উচ্ছেদ করা যাবে না। তবে অন্য কোন আইনের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

ভূমি সংস্কার বিধিমালা ১৯৮৪ জারীর পরে নির্ধারিত ছকে ও মূল্যমানের ষ্ট্যাম্পে তিন কপি বর্গাচুক্তি সম্পাদন ব্যতীত কোন মালিক তার জমি অন্যের নিকট বর্গাচাষের জন্য প্রদান করতে পারবেন না বা কোন বর্গাদার অন্যের জমি বর্গাচাষের জন্য গ্রহণ করতে পারবে না। বর্গাচুক্তি ৫ বছর মেয়াদী হবে। উক্ত চুক্তিনামার একটি কপি বর্গাদারের, এককপি জমির মালিকের এবং একটি কপি নির্ধারিত রাজস্ব অফিসারের নিকট সংরক্ষণ করতে হবে। বর্গাচুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কোন বর্গাদারের মৃত্যু হলে উক্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীনে বর্গাচুক্তি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত মৃত বর্গাদার পরিবারের জীবিত সদস্যগণ বর্গাজমি চাষ অব্যাহত রাখতে পারবেন। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত কারণে প্রদত্ত আদেশ ব্যতীত কোন মালিক বর্গাচুক্তি বাতিল করার অধিকারী হবেন নাঃ

(ক) বর্গাদার যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে বর্গাজমি চাষ করতে ব্যর্থ হলে;

(খ) কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে বর্গাদার সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত বর্গা জমির অনুরূপ জমিতে গড়ে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, সেই পরিমাণ শস্য উৎপাদনে ব্যর্থ হলে;

(গ) বর্গাদার বর্গাজমি কৃষি কাজ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে;

(ঘ) বর্গাদার এই অধ্যাদেশের কোন বিধান বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ লংঘন করলে;

(ঙ) বর্গাদার চাষের অধিকার সমর্পণ করলে বা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে;

(চ) বর্গাদার বর্গাজমি স্বীয় চাষাধীন না রাখলে এবং;

(ছ) মালিক কর্তৃক বর্গাজমি প্রকৃতই ব্যক্তিগত চাষাধীনে আনার প্রয়োজন হলে।

কোন বর্গাদার ১৫ বিঘার বেশী জমি চাষ করতে পারবেন না। বর্গাচুক্তি, খায়-খালসী বন্ধক বা ক্ষেত মজুর হিসাবে ব্যবহার ব্যতীত কেউ অন্যের কোন কৃষি জমি চাষাবাদ করতে পারবেন না। বর্গা জমির ফসল বিভাজন, বর্গা প্রদান, বর্গাচুক্তি বাতিল বা ফসল মাড়ানোর উদ্দেশ্যে ফসল তোলার স্থান সম্পর্কিত বর্গাদার ও মালিকের মধ্যে যাবতীয় বিরোধ নির্ধারিত কর্তপক্ষ নিস্পত্তি করবেন। এই নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না বা কোন মামলা করা যাবে না।

জলমহল ব্যবস্থপনা

বাংলাদেশে বর্তমানে ১০,১০৮ টি জলমহল আছে। এই জলমহল মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকেঃ (১) বদ্ধ জলমহল (২) উন্মুক্ত জলমহল।

(১) বদ্ধ জলমহলঃ যে জলমহলের চতুর্সীমা নির্দিষ্ট অর্থাৎ স্থলাবেষ্টিত এবং যাতে মৎসসমূহের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য বৎসরের নিদির্ষ্ট সময়ে মৎস ধরার উপযোগী। যেমন, হাওড়, বিল, ঝিল, হ্রদ, দিঘী, পুকুর ইত্যাদি।

(২) উন্মুক্ত জলমহলঃ যে সকল জলমহল স্থলাবেষ্টিত নয় এবং নিদির্ষ্ট সময়ের জন্য মৎস্যের পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৎস্য শিকার বন্ধ রাখা যায়না সেগুলোকে উন্মুক্ত জলমহল হিসেবে গণ্য করা হয়।

সাধারণতঃ নদী, খাল বা প্রবাহমান স্রোত ধারাকে উন্মুক্ত জলমহল বলা হয়।

২০ একর পর্যন্ত আয়তনের পুকুর বা বদ্ধ জলমহল ব্যবস্থপনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ জলমহল থেকে লব্ধ আয়ের শতকরা ১ ভাগ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রদান করা এবং অবশিষ্ট আয় উপজেলা পরিষদের জন্য রাখার বিধান করা হয়েছে। যেসব জলমহল মৎস ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত আছে সেগুলির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সেই মন্ত্রণালয়ের উপরই ন্যস্ত থাকবে। তাছাড়াও ১৪০টি জলমহল পরীক্ষাধীন ব্যবস্থাপনার আওতায় থাকবে। অনধিক তিন একর আয়তন বিশিষ্ট জলমহলসমূহ, যার ইজারা মূল্য ৫০০০.০০ টাকার কম, সেগুলি জনগণের প্রথাগত অধিকার হিসাবে স্নান করা, কাপড় কাঁচা, পাট পচানো, মাছ ধরা, সেচ ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ একর প্রতি নামমাত্র বার্ষিক পাঁচ টাকা হিসাবে "৭-ভূমি রাজস্ব জলমহল হতে আয়" খাতে জমা দিয়ে উক্ত জলমহল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করবে। আর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ ব্যবস্থাপনার তদারকী করবেন। এরূপ জলমহল বা তার কোন অংশের জমি কাকেও লীজ দেয়া যাবেন না। এরূপ জলাশয়/জলমহল খাস জমির রেজিষ্ট্রারের প্রথম অংশে অর্থাৎ জনসাধারণের ব্যবহার্য বন্দোবস্তি বহির্ভূত অংশে লিপিবন্ধ থাকবে এবং মালিকানা সরকার পক্ষে কালেক্টরের উপর ন্যস্ত থাকবে। এরূপ জলমহল বাদে ২০ একর পর্যন্ত সব ধরনের জলমহল যার ব্যবস্থাপনা উপজেলা পরিষদের উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে তা ব্যতীত সব জলমহল নীতিমালা অনুযায়ী প্রকাশ্য নীলামের মাধ্যমে ইজারা বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

হাট বাজার ব্যবস্থাপনা

হাট বাজার সমূহ যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন হাটবাজার সম্পূর্ণরূপে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মালিকানায় ন্যস্ত। জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাটবাজারসমূহ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন- ১৯৫০এর ২০ ধারা মোতাবেক সরকারের মালিকানায় ন্যস্ত হয়েছে। আর জনসাধারণের দাবী অনুযায়ী তাদের সুবিধার্থে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি কালেক্টরের নিকট রেজিষ্ট্রি দলিল মূলে হস্তন্তর করে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে, সুনির্দিষ্টভাবে হাটবাজার অন্তর্ভুক্ত জমিতে স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধার্থে কালেক্টর কর্তৃক অনুমোদিত হাটবাজারসমূহ প্রথম হতেই সরকারের মালিকানায় চলে এসেছে। অর্থাৎ

হাটবাজারের মালিকানা সম্পূর্ণভাবেই সরকারের। কোন প্রতিষ্ঠিত হাটবাজারের সংলগ্ন এলাকায় হাটবাজার সম্প্রসারণের প্রয়োজনে সরকারের পক্ষে কালেক্টর উক্ত জমি অধিগ্রহণকরে হাটবাজার ভুক্ত করবেন এবং এরূপ সম্প্রসারিত হাটবাজার এলাকায় ব্যক্তিমালিক টোল আদায় বা কোন প্রকার অর্থ আদায় করতে পারবেন না। কালেক্টর এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তার এলাকাস্থ হাটবাজারের তালিকা সংরক্ষণ করবেন এবং সায়রাত মহল রেজিষ্টারে যথারীতি লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি হাটবাজার পেরিফেরি বা চৌহদ্দী সঠিকভাবে বর্ণনা করে তার পরিমাণ সম্বলিত একটি ম্যাপ সংরক্ষণ করবেন।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল এর ২২৮ বিধি মোতাবেক প্রতিটি উপজেলা/পৌরসভা/পৌর কর্পোরেশনের নিজ নিজ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হাট বাজারের ইজারালদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টনের লক্ষ্যে হাটবাজারসমূহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি নিদির্ষ্ট সময়ের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। নতুন হাটবাজার প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন হাটবাজার তুলে দেয়া সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব জেলা কালেক্টর ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। ২৩০ নং বিধির নির্দেশনা মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে হাটবাজার ইজারা দেয়া যাবে।

ফেরীঘাট ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২রা নভেম্বর ১৯৮৭ তারিখের স্মারক অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/পৌর কর্পোরেশন এর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত ফেরীঘাটসমূহ আয় নির্বিশেষে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যবস্থাপনার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। ফেরীর উঠানামার স্থান একই ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত হলে সেই ফেরী ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা করবে। যেসব ফেরীর উঠা বা নামার যে কোন একটি স্থান এক ইউনিয়নে এবং অপরস্থান অন্য একটি ইউনিয়নে অবস্থিত এরূপ ফেরীর ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের উপরে ন্যস্ত থাকবে। যেসব ফেরীর উঠা বা নামার যে কোন একটি স্থান পৌরসভা/পৌর কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে অবস্থিত এরূপ ফেরীর ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত থাকবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/জেলা প্রশাসক একসনা ভিত্তিতে প্রকাশ্য নীলামের সর্বোচ্চ ডাককারীকে ইজারা প্রদান করবেন । ফেরী ঘাটে যাত্রীদের চলাচলের জন্য উপযুক্ত নৌযান সরবরাহ ও

উঠানামার জন্য প্রয়াজনীয় ঘাট ইজারাদার বা পাটনী নিজ ব্যয়ে নির্মাণ ও সংরক্ষণ করবেন। ইজারা মূল্যের ১% প্রিমিয়াম রূপে ভূমি মন্ত্রণালয়ের "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা দিয়ে চালানের কপি জেলা প্রশাসককে দিতে হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট পরিষদ/পৌরসভার সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে।

রাস্তা সংলগ্ন জমি, কাছারী প্রাঙ্গন

সড়ক ও জনপথ বিভাগ অথবা জেলা পরিষদ রাস্তা সংলগ্ন জমির ব্যবহার সম্পর্কে জনপথ আইনের (Highways /Act -1925) অধীনে প্রণীত বিধিমালা প্রযোজ্য হবে। এরূপ রাস্তা সংলগ্ন জমি লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে কালেক্টর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ ও জেলা পরিষদের অফিসারগণকে সহায়তা দিবেন। সড়ক সংলগ্ন জমিসমূহ সাধারণতঃ কোন লীজ দেয়া যাবে না। এরূপ জমি ব্যবস্থাপনার জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগ নিজেই ব্যবস্থা নিতে পারে, কালেক্টরের উপরে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে অথবা ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যার্পণ করতে পারে। কালেক্টর এরূপ জমি লীজ দেয়ার ক্ষেত্রে সওজ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে নেবেন। আর ভূমি মন্ত্রণালয় খাসভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের নীতিমালানুযায়ী এরূপ জমি বন্দোবস্ত প্রদান করবে। পাথর বালি, চুনাপাথর, কঠিনশীলা জাতীয় খনিজ সম্পদ আহরণ ও অপসারণের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) পাথর, বালু ইত্যাদি আহরণ ও সংগ্রহ করার জন্য উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন অফিসারের নিকট আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে।

(খ) আবেদনে প্রতিটি শ্রেণীর দ্রব্যের চাহিদার আনুমানিক পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

(গ) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী বা উর্ধ্বতন অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত কালেকটর কর্তৃক অনুমোদিত স্থান হতে পাথর, বালু ইত্যাদি আহরণ ও অপসারণ করা যাবে। আহরণের অনুমতিপত্র সরকার নির্ধারিত ফরমে প্রদান করতে হবে।

(ঘ)প্রচলিত বাজার মূল্যে ও স্থানীয় অবস্থা দৃষ্টে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত ও বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদিত হারে ইজারা মূল্য আদায় করতে হবে।

(ঙ) ন্যূনতম সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর পদ মর্যাদা সম্পন্ন অফিসারের তত্ত্বাবধানে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্তৃক আহরিত পাথর, বালু ইত্যাদির পরিমাণ মাপ ও যাচাই করার উদ্দেশ্যে তা সুবিধা-জনক স্থানে রাখতে হবে

অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের অধীনে প্রণীত পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি ১৯৬৫এর ১৮২ বিধি মোতাবেক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এলাকার যেসব নাগরিক ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখে ভারতে অবস্থানরত ছিলেন বা ঐ তারিখ হতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ (জারুরী অবস্থা প্রত্যাহারের তারিখ) পর্যন্ত ভারতে গমন করেছেন তাদের যাবতীয় সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলে গণ্য হয় এবং এর ব্যবস্থানা উপতত্ত্বাবধায়কের উপরে ন্যস্ত করা হয়। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করার পরে The Enemy Property (continuannce of Emergency Provision) Ordinance,1969 এর বিধান অনুযায়ী শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধানসমূহ বলবৎ রাখা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই অধ্যাদেশ বাতিল করে The Enemy Property (continuannce of Emergency Provisions (Repeal) Act, 1974 জারী করা হয়। এই আইন অনুযায়ী যেসব শত্রু সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়ক/উপ-তত্ত্বাবধায়কের উপরে ন্যস্ত হয়েছিল সেসব সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে সরকারে বর্তায়। The Vested & Non Resident Property (Administration) Act 1974 এর বিধান মোতাবেক যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক নন বা নাগরিকত্ব হারিয়েছেন অথবা বিদেশী নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন তার সম্পত্তি অনাবাসিক সম্পত্তি হিসাবে সরকারে বর্তেছে। সেসব সম্পত্তির দখল সরকার গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক এসব জমি অবৈধ দখলদারমুক্ত করার জন্য উচ্ছেদ প্রক্রিয়াও অনুসরণ করবেন। জেলা প্রশাসকের এ ক্ষমতা ইউএনও প্রয়োগ করতে পারবেন। কোন অর্পিত সম্পত্তি পুনঃঅবৈধভাবে বেদখল হয়ে গেলে জেলা প্রশাসক বা তার ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসার তাকে উচ্ছেদ করে উক্ত সম্পত্তি সরকারের দখলে আনবেন। সকল অর্পিত সম্পত্তি (জমি/ইমারত) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার অর্পিত সম্পত্তি ইজারা বা ভাড়া দিতে পারবেন এবং উক্ত সম্পত্তির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বপ্রকার পদক্ষেপ নিবেন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ইজারার শর্ত ভঙ্গের কারণে নব্য ইজারা/ভাড়ার অর্থ প্রদানে

ব্যর্থ হলে ইউএনও লীজ বাতিল করবেন এবং অর্পিত সম্পত্তির যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। ইজারা প্রদানের সুবিধার্থে অর্পিত সম্পত্তি আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ (ক) কৃষি জমি, (খ) পতিত অকৃষি জমি, (গ) গ্রামাঞ্চলে কাঁচা বা পাকা বাড়ী/ঘর, (ঘ) শহারাঞ্চলে কাঁচা বা পাকা বাড়ী/ঘর, (ঙ) দোকান/ গুদাম ঘর ইত্যাদি, (চ) ফলের বাগান, (ছ) পুকুর, দীঘি, বিল, জলাশয় এবং (জ) অর্পিত সম্পত্তিতে অবস্থিত অস্থাবর সম্পত্তি বা যাহা ভূমির সাথে গ্রথিত। সকল কৃষি জমি একসনা ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে লীজ দেয়া যাবেঃ

(ক) লীজ বলবত হওয়ার আগেই সমুদয় লীজ অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে হবে।

(খ) লীজযুক্ত জমির শ্রেণীগত বা ভৌগলিক কোন পরিবর্তন করা যাবেনা।

(গ) কোন রূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে যে কোন সময় লীজ বাতিল করা যাবে।

ঘ) ইজারাদার লীজ সম্পত্তিতে কোনরূপ দায় সৃষ্টি করতে পারবেনা সাব-লীজ দিতে পারবেনা।

সরকার প্রচলিত নীতি নির্দেশার আলোকে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রামের উন্নয়ন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত অকৃষি জমি আবাসিক উদ্দেশ্যে প্রকৃত বিবেচনা যোগ্য ব্যক্তির নিকট অনূর্ধ্ব ১০ কাঠা জমি দীর্ঘ মেয়াদী লীজ দেয়া যাবে। আর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ৫ কাঠা জমি সরকার আরোপিত শর্তে লীজ দেয়া যাবে। হাট বাজারের জমি সর্বোচ্চ ডাককারীকে অনূর্ধ্ব ৫ কাঠা পর্যন্ত লীজ দেয়া যাবে। কাঁচা/ পাকা বাড়ী ঘর, দোকান, গুদাম ইত্যাদি অন্যরূপ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সরকারের প্রকাশ্য নীলামে সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট বাৎসরিক ভিত্তিতে লীজ দেয়ার নিয়ম অব্যাহত থাকবে। পুকুর, দীঘি বা ফলের বাগান ইত্যাদি তিন বছর মেয়াদে প্রকাশ্য নীলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাককারীকে ইজারা দেয়া যাবে। অর্থাৎ সকল অস্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাককারীকে দেয়া যাবে। এতে প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যবান দ্রব্যাদি বা বই জাতীয় যাদুঘর ও জাতীয় গ্রন্থাগারে সমর্পণ করা হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার লীজ প্রদানের লক্ষ্যে নীলাম পরিচালনা করবেন।

১৯৬৭-৬৮ সালে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে সরকারী নির্দেশে প্রত্যেক জেলায় অর্পিত সম্পত্তির (তৎকালীন শত্রু সম্পত্তি) একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ প্রণয়ন করেছিলেন। এই তালিকার ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার সম্পত্তির দখলকারীকে নোটিশ ও শুনানীর সুযোগ প্রদান করে অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা ও দখল নিতেন । অর্পিত সম্পত্তি ভুলভাবে তালিকাভুক্তি বা অন্য কোন সংগত কারণে কোন সম্পত্তি প্রকৃত অর্পিত সম্পত্তি নয়, এরূপ প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট মালিক/দখলকারের আবেদনের ভিত্তিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) যথাযথ শুনানী প্রদান ও কাগজপত্র পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে তিনি ঐ সম্পত্তি অবমুক্ত করার সুপারিশ সহকারেঃ (ক) অনধিক ৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমি অবমুক্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এবং (খ) অকৃষি জমি ও ৫বিঘার উর্ধ্বে জমির ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিকট নথি পাঠাবেন। বিভাগীয় কমিশনার/ভূমি সংস্কার বোর্ড প্রয়োজনে শুনানী গ্রহণ করে চূড়ান্ত আদেশ দিবেন ও জেলা প্রশাসক ঐ আদেশের ভিত্তিতে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা সংশোধন করবেন। অর্পিত সম্পত্তি হতে যাবতীয় আয় সুনির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা হবে। অর্পিত ঘরবাড়ী, ইমারত ইত্যাদি মেরামত/সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) প্রয়োজন মনে করলে প্রাপ্ত আয়ের ১৬% ব্যয় করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশ মোতাবেক ২১/৬/৮৪ তারিখ হতে নতুন ভাবে অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা ও দখল গ্রহণ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে। নতুন ভাবে আর কোন সম্পত্তি অর্পিত হিসাবে ঘোষণা দেয়া যাবে না। তবে যে সব সম্পত্তি সরকারী আওতাধীন ও ব্যবস্থাপনায় আছে সে সব সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সরকারীভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

বিনিময় সম্পত্তি নিয়মিতকরণ

বাংলাদেশ থেকে দেশত্যাগী হিন্দু এবং ভারত থেকে বিতাড়িত বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি বিনিময় কেইসসমূহের মধ্যে ৬/৯/১৯৬৫ ইং তারিখের আগে (অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ) জারীর পূর্বে বিনময়কৃত সম্পত্তিই নিয়মিত করা যাবে। এরূপ সম্পত্তিকে আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ (ক) ১০/১০/১৯৬৪ ইং তারিখের পূর্বে বিনিময়কৃত সম্পত্তি যা পরবর্তীতে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। (খ) ১০/১০/১৯৬৪ ইং থেকে ৫/৬/১৯৬৫ ইং তারিখের মধ্যে যেসব সম্পত্তি বিনিময় করা হয়েছে।

১০/১০/ ১৯৬৪ ইং এর পূর্বে বিনিময়কৃত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে বিধায় জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট ভারত-প্রত্যাগত মুসলমান বিনিময়কারী দখলকারগণ হতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রকৃত বিনিময় বলে সন্তুষ্ট হয়ে বিনিময় নিয়মিতকরণের আদেশ দিবেন এবং এই আদেশের ভিত্তিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিনিময়কারীর অনুকূলে হস্তান্তর দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি করে দিবেন। এ জন্য কোন সালামী মূল্য দিতে হবে না বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনেরও প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ১০/১০/১৯৬৪ হতে ৫/৯/১৯৬৫ ইং পর্যন্ত সময়ে বিনিময়কৃত সম্পত্তি The East Pakistan Disturbed Persons (Rehabilitation) Ordinance-1964) এর ৬ক ধারা মোতাবেক সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে এরূপ সম্পত্তির বিনিময় নিয়মিতকরণের আবেদন পাওয়ার পরে জেলা প্রশাসক তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রকৃতভাবে বিনিময় হয়েছে বলে সন্তুষ্ট হলে তিনি প্রথমে উক্ত জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে আদেশ দিবেন এবং একইসঙ্গে বিনিময়কারীর সাথে সালামী ছাড়াই বন্দোবস্তির আদেশ দিবেন। প্রকৃত পক্ষে বিনিময় হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য জেলা প্রশাসক নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করবেনঃ

(ক) আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) থাকুক বা না থাকুক দলিলের যথার্থতা ;

(খ) বিনিময় আবেদনকারী প্রকৃতপক্ষে ভারত প্রত্যাবর্তনকারী বা বাস্তুত্যাগী কিনা;

(গ) বিনিময় দাবীকৃত সম্পত্তি প্রকৃত পক্ষে তথাকথিত দেশত্যাগী হিন্দুর মালিকানাধীন ছিল কিনা;

(ঘ) ভারতীয় সম্পত্তি বিনিময় সংক্রান্ত কোন রেজেষ্ট্রিকৃত দলিল না থাকলে জেলা প্রশাসক বিনিময় প্রমাণের জন্য উপযুক্ত কাগজপত্র তলব করতে পারেন;

নামজারী জমা খারিজ

১৯৫৬ সালের এপ্রিল থেকে শুরু করে ১৯৬২ পর্যন্ত সময়কালে একই সাথে সকল জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপ করে জমিদারগণকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের তালিকা প্রণয়ন ও ভূমি মালিকগণকে সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ ও রেকর্ড সংশোধনী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ জরিপের মাধ্যমে ভূমি মালিকের নাম ও তার জমির বিবরণাদি সম্বলিত একটি কপি তহশীল (ইউনিয়ন ভূমি) অফিসে এবং অন্যটি সার্কেল পরিদর্শক

(উপজেলা রাজস্ব) অফিসে এবং অন্য একটি কপি জেলা রেকর্ড রুমে সংরক্ষণের জন্য দেয়া হয়। এটাই এস,এ খতিয়ান হিসাবে পরিচিত। প্রয়োজনে কোন জেলায় বা এলাকায় পুনরায় জরিপ করে পূর্ববর্তী জরিপে প্রণীত মৌজা নক্সা এবং খতিয়ান সংশোধন ও হালকরণের জন্য জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১৪৪ ধারায় বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনের ১৪৪ ধারা এবং সার্ভে আইন ১৮৭৫ এর ৩ ধারা অনুসারে সরকার কোন জেলা বা এলাকায় জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়নের জন্য প্রজ্ঞাপন জারী করলে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংশোধনী বা পুরা দস্তর ক্যাডাষ্ট্রল জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এইরূপ জরিপে প্রণীত রেকর্ড বা খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে এমর্মে গেজেট প্রজ্ঞাপন জারী হওয়ার পরে এ নতুন খতিয়ান কার্যকর হয় এবং সাবেক জরিপে প্রণীত খতিয়ান তার কার্যকরতা হারায়।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এ জরিপ রেকর্ড সংশোধন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় বলে দু'জরিপের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তরাধিকার, দান, বিক্রি ইত্যাদি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার ফলে ভূমি মালিকানার পরিবর্তন জরিপে প্রণীত খতিয়ানে প্রতিফলিত করার জন্য অর্থাৎ খতিয়ান হালকরণের জন্য জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারায় কালেক্টরকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। জমা খারিজ, একত্রিকরণ ও নামজারীর মাধ্যমে কালেক্টর অন্তর্বতীকালীন সময়ে খতিয়ান সংশোধন ও হালকরণ করে থাকেন। উক্ত ধারা মোতাবেক কালেক্টর করণিক ভ্রান্তি সংশোধনসহ নিম্নোক্ত কারণে খতিয়ান সংশোধন সহকরে হালকরণকৃত খতিয়ান সংরক্ষণ করবেনঃ

(ক) উত্তরাধিকার বা হস্তান্তরমূলে মালিকানা পরিবর্তন;
(খ) জমা একত্রীকরণ ও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় মালিকানা পরিবর্তন ;
(গ) সরকার কর্তৃক অন্য খাসজমি বন্দোবস্তি প্রদান;
(ঘ) পরিত্যক্ত বা পয়স্তিজনিত কারণে ভূমি কর মওকুফ;

ভূমি মালিকের মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারগণের নামে নামজারী করা হয়। এতে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য জরুরীভাবে তহশীলদার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেন সেজন্য সতর্কদৃষ্টি রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আবার ভূমি হস্তান্তর ও রেজিষ্ট্রেশন আইন অনুযায়ী জমি হস্তান্তর হলে তার ভিত্তিতে বেশ

কিছু সর্তকতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ সাপেক্ষে জমির নামজারী ও জমাখারিজ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা উচিৎ ।

জমাবিভক্তিঃ নামজারী করার সময় কোন বৃহৎ প্লট বা দাগ বিভক্তির প্রয়োজন দেখা দিলে মৌজার হাল নক্সা হতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন সূচক একটি ট্রেসম্যাপ নামজারী নথির সাথে প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করতে হবে। নতুন প্লটের জন্য একটি পৃথক দাগ নম্বর দিতে হবে এবং তা মৌজার দাগসূচীর ক্রমানুসারে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ - যদি মূল দাগ নম্বর ৭২ হয় এবং মৌজায় মোট ৩৭৫ টি প্লটের জমি থাকে তবে নতুন দাগ নম্বর হবে ৭২/৩৭৬ । সহকারী কমিশনার (ভূমি) নামজারী আদেশ দেবার সাথে সাথে নতুন খতিয়ান সৃজন করবেন এবং ১,২, এবং ৯ নম্বর রেজিষ্টারে তা সংশোধনক্রমে লিপিবদ্ধ করেন। আর তিনি এ রেকর্ড 'খ' শ্রেণীভুক্ত হিসাবে সংরক্ষণ করবেন।

নাব্য নদীতে অনুপ্রবেশ

সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কালেক্টর সকল নৌ-পরিবহনযোগ্য নদী ও নদী প্রবাহের তত্ত্বাবধায়ক। নৌ-পরিবহনযোগ্য সকল নদী (অর্থাৎ নাব্য নদী), সংযোগ খাল প্রবাহসমূহের তলদেশ ও ফোরশোরসমূহের উপরে সরকারের নিরংকুশ ক্ষমতা আছে। নদী তীরবর্তী কোন ভূমি মালিকের নদীর তলদেশ বা ফোর শোরের উপরে কোন অধিকার নাই। যদি কেউ উক্ত জোয়ার রেখার নিম্নে কোন প্রকার অনুপ্রবেশ করেন বা জেটী, স্নান ঘাট ইত্যাদি এমন ভাবে নির্মাণ করেন যা নদীর উচ্চ জোয়ার রেখার নিম্ন পর্যন্ত প্রসারিত, তবে তিনি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত হবেন এবং কালেক্টর তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন। কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে দেওয়ানি আদালতের মাধ্যমে এরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বা সরকার প্রদত্ত ইজারা ব্যতীত নদীর তলদেশ বা তার ফোরশোরগুলোতে বালু, নুড়ী পাথর সংগ্রহ বা অপসারণ করতে দেয়া হবে না। সড়ক বা বাঁধ নির্মাণের বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত নদী তীরবর্তী জমিতে সরকারের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও অধিকার থাকবে।

রেজিষ্টার ও রিটার্নসমূহ

ভূমি ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত অফিসারগণকে রেজিষ্টার সংরক্ষণ ও নিয়মিত প্রতিবেদন বিবরণী (রিটার্ন) দাখিল করতে হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা কাজে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ রেজিষ্টারগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত রেজিষ্টারগুলি উল্লেখযোগ্যঃ

রেজিষ্টার -১ঃ জমাবন্দী রেজিষ্টার হিসাবে পরিচিত এই রেজিষ্টারে জমি মালিকের নাম, জমির পরিমাণ, জমির শ্রেণী ইত্যাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। সেটেলমেন্ট অপারেশন কালে প্রণীত খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরে বাঁধাই করে এই রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হয়। এ রেজিষ্টারের শেষের দিকে পরবর্তীতে বিভাজন ও নামজারীর জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সাদা পৃষ্ঠা সংযোজন করতে হয়। আর জরিপ পরবর্তী রেজিষ্টারে সাদা ফরম সংযোজন করতঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজিষ্টারের পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রত্যায়ন করে সীল ও স্বাক্ষর করবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আদেশ ব্যতীত এই রেজিষ্টারে কোনরূপ পরিবর্তন করা যায় না।

রেজিষ্টার-২ঃ এ রেজিষ্টার ভূমি মালিকানা বা তলববাকী রেজিষ্টার নামে পরিচিত। ভূমি মালিক কর্তৃক পরিশোধিত করের পরিমাণ ও দাখিলার নম্বর এবং মানি অর্ডার বা চালানোর মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকলে মানি অর্ডার বা চালানোর তারিখ এবং নম্বর এই রেজিষ্টারে যথাযোগ্য কলামে লিপিবদ্ধ করতে হয়। ম্যানুয়ালের ৩৬০ নং বিধিতে এই রেজিষ্টার লিপিবদ্ধ করার নিয়ম পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে।

রেজিষ্টার -৩ঃ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী (তহশীলদার) দৈনন্দিন কর, করের উপর প্রদেয় সুদ বা অন্য কোনরূপ আরোপিত কর, ফিস ইত্যাদি বাবদ যা আদায় করেন তা এই রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হয়। এই রেজিষ্টারে লিখিত আদায়ের বিবরণের সাথে ২ নম্বর রেজিষ্টারেও তা লিখতে হয়।

রেজিষ্টার-৪ঃ এ রেজিষ্টারটি একমাত্র ক্যাশ রেজিষ্টার হিসাবে বিবেচিত। এ রেজিষ্টারে প্রতিটি জমা ও খরচের বিবরণী লিখতে হয়। ৩ নং এবং ৪ নং রেজিষ্টারের বিভিন্ন আদায়কৃত অর্থের যে হিসাব লিখা হয় তদনুযায়ী আদায় এবং ট্রেজারীতে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ এ রেজিষ্টারের ৩ এবং ৮নং কলামে লিপিবদ্ধ করা হয়।

রেজিষ্টার-৫ঃ ট্রেজারী পাসবইটিই রেজিষ্টার -৫ হিসাবে পরিচিত।

রেজিষ্টার-৬ঃ বিভিন্ন ধরনের দাবী যেমন-বনজদ্রব্য, সামগ্রীর লীজ, ফেরীঘাট, জলমহল, হাট ইত্যাদির দাবী বা বাৎসরিক ইজারা দানের যে দাবী হয় তা এ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

রেজিষ্টার-৭ঃ রেজিষ্টারভুক্ত ভূমি মালিকগণ হতে প্রাপ্য কর ও সুদ ব্যতীত সরকারের অন্যান্য সবরকমের প্রাপ্যের জন্য এই রেজিষ্টার ব্যবহৃত হয়। ৩নং রেজিষ্টারের ন্যায় সবরকমের বিবিধ দাবী আদায়ের বিবরণ এতে লিখতে হয়।

রেজিষ্টার-৮ঃ এই রেজিষ্টার খাস জমির রেজিষ্টার হিসেবে পরিচিত। এই রেজিষ্টারের জন্য নির্ধারিত ফরম মোট ৪টি অংশে সংরক্ষণ করতে হয়।

(১) এই অংশে সর্বসাধারণের ব্যবহারের অধিকার সম্বলিত বিবরণ থাকবে অর্থাৎ রাস্তা, হালট, পানীয় জলের পুকুর, বাঁধ, কূপ ইত্যাদি যা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য অধিকার থাকার কারণে লিজ দেয়া যায় না।

(২) যে সকল খাস জমি চাষ যোগ্য জমি বা সায়রাত হিসাবে বন্দোবস্তি দেয়ার যোগ্য তার বিবরণ এই অংশে থাকবে।

(৩) সরকার যে সব জমি ক্রয় করেছেন অথবা আইনানুগ ভাবে পুনঃগ্রহণ করেছেন বা পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে সরকারের মালিকানাধীন হয়েছে তার বিবরণ এ অংশে থাকবে।

(৪) নদী সিকস্তি খাস জমির বিবরণ এ অংশে থাকবে।

সকল শ্রেণীর খাস জমি পতিত অবস্থায় বৎসরে কয়েকবার নিয়মিতভাবে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী পরিদর্শন করবেন এবং মন্তব্য ৮ নম্বর রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। অনুরূপভাবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিয়মিতভাবে এরূপ জমি পরির্দশন করবেন। নদী সিকস্তি জমি পয়স্তি হয়েছে কিনা এবং নতুন চরের জমি চাষ যোগ্য হয়েছে কিনা তা পরিদর্শন করবেন।

রেজিষ্টার-৯ঃ এই রেজিষ্টার নাম জারীর রেজিষ্টার হিসেবে অভিহিত যা দুই অংশে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রথম অংশ উত্তরাধিকার বা জমা খারিজের আবেদনের প্রেক্ষিতে নাম জারীর জন্য ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয় অংশ বিক্রয়, দান ইত্যাদি জনিত কারণে সাবরেজিষ্টারের অফিস অথবা আদালত হতে প্রাপ্ত নোটিশ বা আদেশের ভিত্তিতে নাম জারীর জন্য ব্যবহৃত হবে।

রেজিষ্টার-১০ঃ এক বৎসরের বেশী মেয়াদী লিজের ক্ষেত্রে এ রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে। মেয়াদী লিজের ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই পুনঃ লিজ নিশ্চিত করাই এই রেজিষ্টার সংরক্ষণের মূল লক্ষ্য।

রেজিষ্টার-১২ঃ জমি বন্দোবস্তির জন্য প্রস্তাবসমূহ এই রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। সব শ্রেণীর খাস জমি, সরকার কর্তৃক ক্রীত জমি বা পরিত্যক্ত জমির জন্য এই রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

রেজিষ্টার-১৩ঃ যে সকল দরখাস্ত বা আবেদনের জন্য কোন রেজিষ্টার নির্দিষ্ট করা হয়নি সেসব আবেদন বিবেচনার জন্য এই রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

রেজিষ্টার-১৭ঃ জেলা কালেক্টরেট অফিসের সংরক্ষিত এই রেজিষ্টারটি চালান রেজিষ্টার হিসেবে অভিহিত । প্রতিটি উপজেলার জন্য বা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য পৃথক ভলিউম সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

রেজিষ্টার-২৬ঃ প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে ঊর্ধ্বতন তদারকী অফিসারগণ কর্তৃক অফিস পরিদর্শনান্তে পরিদর্শন মন্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য এই রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হয়।

রেজিষ্টার-৩২ঃ ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা উপজেলা ভূমি অফিসে আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত কর্মচারীগণের জামানত হিসেবে সংরক্ষণের জন্য এই রেজিষ্টার ব্যবহার করতে হয়।

রিটার্ন বা নিয়মিত বিবরণীঃ রিটার্ন-১ সব প্রজাস্বত্ব বা প্রজাবিলি ভূমির বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন করের দাবী-আদায় ও বকেয়া সংক্রান্ত ১২ মাসের প্রতিবেদন প্রতিবছরের ১৫ই মে তারিখের মধ্যে কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করতে হয়। কালেক্টর এই কপি কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি সংস্কার বোর্ডে পাঠাবেন।

রিটার্ন-২ঃ ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের অগ্রগতি সম্বলিত প্রতিবেদন তহশীলদার প্রতি মাসে প্রণয়ন করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও কালেক্টরের নিকট পাঠাবেন।

রিটার্ন-৩ঃ বৎসর শেষ হওয়া মাত্র কর খেলাপকারীদের (যিনি ৩০শে চৈত্রের মধ্যে কর শোধ করেননি তিনি কর খেলাপী) বিবরণ সম্বলিত এই রিটার্ন ভূমি সহকারী প্রণয়ন করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট প্রেরণ করবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী প্রাপ্য আদায় আইন (সার্টিফিকেট) মামলা করতে হবে তার নির্দেশ দিবেন ।

ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য P.D.R act-1913 এর আওতায় সার্টিফিকেট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। তবে এই প্রক্রিয়া তখনই প্রয়োগ করা উচিৎ যখন সাধারণভাবে ভূমি মালিকগণ কর প্রদানের সামর্থ রাখেন। কারণ কর আদায় কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এবং জনমনে কর পরিশোধ না করার অপচেষ্টা প্রতিরোধের জন্য মূলতঃ এই মামলার বিধান রাখা হয়েছে। প্রসংগত একটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিৎ যে, লাল নোটিশ জারী না করে কোন মামলা রজু করা ঠিক নয়।

কর্মচারীর জামানত

উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কর্মরত হিসাব রক্ষক, নাজির-কাম-ক্যাশিয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী, সব কর্মচারীগণের প্রত্যেকের ৫০০০/- টাকা হারে নগদ জামানত রাখার বিধান করা হয়েছে। এই জামানত কিস্তিতে পরিশোধ করার জন্য কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিতে পারেন। কর্মচারী তিনজন জামিনদার সহকারে মোট ১৫,০০০/- টাকার বন্ড প্রদান করবেন। এ বন্ডসমূহ রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরের হেফাজতে রাখতে হবে।

হিসাব প্রক্রিয়া

ভূমি উন্নয়ন কর, হাটের প্রাপ্য, লীজ অথবা যে কোন রকমের সরকারী প্রাপ্য পরিশোধের স্বীকৃতি হিসাবে আদায়কারী রশিদ প্রদান করবেন। আদায়ের পরে প্রত্যেক আদায় রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ভূমি কর বা অন্য যে কোন আদায় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সামনে দেয়ালে প্রকাশ্যভাবে নীচের কথাগুলি লিখে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে ঃ

> *"প্রত্যেক ব্যক্তি/ভূমি মালিক ভূমি উন্নয়ন কর বা উহার উপরে সুদ বা অন্য কোন সরকারী প্রাপ্য পরিশোধ কালে ইউনিয়ন ভূমি সহকারীর নিকট হইতে অবশ্যই রশিদ গ্রহণ করিবেন। আবওয়াব অথবা অন্য কোন আইন বর্হিভূত অর্থ প্রদান ও গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ" ।*

মানি অর্ডারযোগ্য ভূমি উন্নয়ন কর পাওয়া গেলে পৃথক রশিদ না দিয়ে মানি অর্ডার নম্বর এবং তারিখ দিয়ে রেজিষ্টারে সেটি লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট চালান কুপনটি গার্ড ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যক্তি/সংস্থার মালিকানাধীন জমির উপরে সরকার নির্দেশিত হারে সুদ নির্ধারণ করতে হবে। সার্টিফিকেট প্রস্তুতের তারিখ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ ধার্য করার নিয়মাবলী ১৯৫৫ সালের সার্টিফিকেট ম্যানুয়ালের ২৭(২) নং বিধির নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। যথাঃ

(ক) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদ হিসাব করতে হবে।

(খ) ১২/- টাকার নিম্নে কোন দাবীর সুদ হিসাব করা হবে না।

(গ) সার্টিফিকেট প্রস্তুত করার তারিখ হতে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত সময় তিন মাসের কম হলে কোন সুদ আরোপ করা হবে না। তবে তিন মাসের বেশী হলে সম্পূর্ণ সময়ের জন্য সুদ আরোপ করা হবে।

(ঘ) তিন মাসের অতিরিক্ত কোন মাসের ভগ্নাংশ ও ১২/- টাকার অতিরিক্ত কোন টাকার ভগ্নাংশ অগ্রাহ্য হবে।

(ঙ)কোন পরওয়ানার নোটিশে বা বিক্রয় পরওয়ানায় সার্টিফিকেট অফিসার সার্টিফিকেটের মূল দাবী, প্রসেস ফি এবং আরোপিত সুদের হার যোগ করে মোট দাবী দেখাবেন।

সরকারের অনুমোদন ক্রমে কালেক্টর কোন এলাকায় সমগ্র এলাকা বা বিশেষ ক্ষেত্রে ফসলহানির কারণে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট কেসের সুদ মওকুপ করতে পারবেন। আদয়কৃত অর্থ ভূমি সহকারী আদায়ের দিনই বা পরদিন ট্রেজারীতে ট্রেজারী চালানযোগে পাসবই সহজমা প্রদান করবেন। ট্রেজারী চালান তিন কপিতে লিখতে হবে।

পরিদর্শন ও তদারকি

উর্ধ্বতন অফিসার কর্তৃক অর্ধবঃস্তন অফিসসমূহ পরিদর্শনের ফলে অফিসের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অধিকতর সহজ ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়। এজন্য কালেক্টর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও ডেপুটি কালেক্টরগণের জন্য প্রতিমাসে সফরের দিবস সংখ্যা বিভিন্ন সার্কুলার জারী করে নির্ধারণ করা হয়েছে। অধস্তন অফিসারগণ নিয়মিত সফর করেছেন কিনা তা ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় কালেক্টর পর্যালোচনা করবেন। আর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাসের ১৫দিন সফরে

থেকে তাঁর অধীনস্থ সকল ভূমি অফিস পরিদর্শন করবেন। এসময় রেজিষ্টার ২ হতে ৮ পর্যন্ত সব রেজিষ্টারের সাথে কর ও ফিস আদায়ের রসিদের মূল কপি তুলনামূলক নিরীক্ষা করে আদায়ের ১০০% তাকে নিরীক্ষা করতে হবে। তিনি পরিদর্শনকালে অধস্তন কর্মচারীদের আদায়কৃত অর্থ নিয়মিতভাবে জমা প্রদান প্রক্রিয়া, খাস জমির ১০% সরজমিনে পরিদর্শন, নামজারী কেসসমূহ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহ যথাযথভাবে এবং নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হয় কিনা, তা পরির্দশনকালে যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন। পরির্দশন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষকে সামনে রেখে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিদর্শন কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেন সেজন্য ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালে বর্ণিত প্রশ্নমালা অনুসরণ করার বিধান রাখা হয়েছে।

উপসংহার

উপরের আলোচনার মাধ্যমে একথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া। ভূমি ব্যবস্থাপনা যত সুচারুরূপে ও সুন্দররূপে সম্পন্ন করা যাবে, সমাজের মানুষ ততই স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দের সাথে জীবন যাপন করতে পারবে। প্রায়ই ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে বলা হয় যে এটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া । ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইনের অস্পষ্টতা এবং পর্যাপ্ত ও যুগোপযোগী আইনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন বা বিধি-বিধানের স্পষ্ট ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। একথা অনস্বীকার্য যে, ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো উপযোগী আইন বা বিধানসমূহ হালকরণ (Uptodate) হওয়া দরকার। কিন্তু এর চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তা হলো, ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিস্বার্থভাবে ও একাগ্রতার সাথে এমন বিধি-বিধান প্রণয়নে অগ্রনী ভূমিকা পালনে ব্রতী হওয়া। কিন্তু হতশাব্যঞ্জক হলেও সত্য যে, ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আইন ও বিধি-বিধান প্রায়ই যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়না বা সেগুলি যথার্থভাবে প্রয়োগ করা হয় না। এজন্য কাউকে সুস্পষ্টভাবে দোষারোপ না করে একথা বলা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগসমূহের অন্যান্য বিভাগসমূহে যারা কর্মরত আছেন তাদের মতোই ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার

সাথে সম্পৃক্ত কর্মীবাহিনীর মধ্যে একাগ্রতার অভাব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সময় যে সব শর্তাবলী মেনে নিয়ে একজন কর্মী প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের নিঃস্বার্থ সেবা প্রদানের যে ওয়াদা করেন তা যদি তিনি তার কর্মজীবনে যথাযথভাবে পালন করেন তবে ভূমি ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য নির্দেশিকা

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) (১৯৯৩) *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭৭৪-১৯৭১), অর্থনৈতিক ইতিহাস। ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। (দ্বিতীয় খন্ড)

উমর, বদরুদ্দিন (১৯৭৪) *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো বাংলাদেশের কৃষক* । ঢাকাঃ সুবর্ণ প্রকাশনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৩) *ভূমি সংস্কার কমিটি প্রতিবেদন* । ঢাকাঃ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস ।

কাদের, মুহাম্মদ আব্দুল (১৯৯৬) ভূমি আইনের মৌলিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা। *লোকপ্রশাসন সাময়িকী*, ৫ম সংখ্যা। ঢাকাঃ বিপিএটিসি।

ভূমি প্রশাসন বোর্ড (১৯৮৭) *ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল*। ঢাকাঃ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়।

ভূমি মন্ত্রণালয় (১৯৯০) *ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল*। ঢাকা: বাংলাদেশ।

মামুন , মুনতাসির (সম্পাদিত) *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংগালী সমাজ*। ঢাকা।

মিয়া, আব্দুল কাদের (১৯৮৯) *ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা* । ঢাকাঃ কাশবন মুদ্রায়ন।

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী,
পঞ্চদশ সংখ্যা
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম ও কর্মচারীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নঃ একটি পর্যালোচনা

এস এম জোবায়ের এনামুল করিম*

Functions of the Government Employees Welfare Directorate and Socio-Economic Development of the Employees: An Overview.

SM Zobayer Enamul Karim.

ABSTRACT: The initiation of this article is to inform the concerned persons about the welfare progrmmes undertaken and being implementd for the socio-economic development of the officers/employees and their family members by Government Employee Welfare Directorate & Board of Trustees under the scheme of Benevolent and Group Insurance Fund for Government and Autonomous Bodies. Government Employee Welfare Directorate administers group based socio-economic programmes for the employees. The programmes aim to establish club/community centres and to extend financial assistance for these activities, to run women technical training centre and day care child centre, to develop physical exercise/sports and to arrange annual sports competition, to establish recreation centre, to extend finanical support for meeting the costly medical expenses both incountry and outside the country and to run funancial assistance programmes for the retired Govt. employees. Besides, under the scheme of funcancial assistance programmes–educational stipend, medical assistance, funancial help, staff bus project for the government employees are also arranged. This article highlihgts the organization structure of Board ofTrustees, Government and Autonomous Bodies – Employees Welfare and Group Insurance Directorate.

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব । পারস্পারিক সহানুভূতি, স্নেহ, দয়া-মায়া, সমবেদনা প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলী মানুষকে একত্রে বসবাসের অনুপ্রেরণা যোগায়। এ অনুপ্রেরণা থেকেই কল্যাণধর্মী পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ সাধিত হয়। মানুষের এ সহজাত ও স্বাভাবিক মমত্ববোধ তাকে অপরের বিপদে আপদে, দুঃখ-দুর্দশায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। মূলতঃ পৃথিবীর ইতিহাস যত পুরাতন, মানব কল্যাণের ধারণাও তত পুরাতন। সকল ধর্মেরই অন্যতম উদ্দেশ্য সৃষ্টি জীবের কল্যাণ সাধন । ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ধর্মীয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ বঞ্চিত, অসহায়, অবহেলিত, দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করত। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র হিসাবে পরবর্তিতে আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সর্বজনবিদিত । পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন নরওয়ে ও জাপান তাদের প্রায় সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশও তার সীমিত সামর্থের মধ্যে এ প্রচেষ্টায় শরীক হওয়ার চেষ্টা করছে।

* সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, বিপিএটিসি।

দারিদ্র, বেকারত্ব, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা ও উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঐতিহ্য নিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশসমূহের অন্যতম হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে চিহ্নিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ দেশের ১২ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৬০ জন বর্তমানে দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করছে (Task Fonce 1990:104)। সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য সরকার নিরলসভাবে প্রচষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; এতোদুদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহারের পাশাপাশি সম্মিলিত জাতিসংঘের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ও বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থা থেকে অনুদান ও ঋণ গ্রহণ করে তা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশী ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যেমে শিল্পায়ন তরান্বিত এবং বেকারত্ব দূরীকরণ ও মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির ও দারিদ্র দূরীকরণের প্রচেষ্টা সরকার অব্যাহত রাখছে। কিন্তু সমস্যার ব্যাপকতা এত গভীর যে, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে এ প্রচেষ্টার ফলাফল এখনও আশানুরূপ পর্যায়ে উন্নীত হয়নি।

প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের সেবা ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং জনজীবনে শৃংখলা বজায় রাখার জন্য এদেশে রয়েছে একটি সুশৃংখল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাহিনী। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা-১০ লক্ষ (GOB, 1999)। এরা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১% (কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রেণীভিত্তিক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট 'ক' এ দেয়া হলো)। দেশের প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে সরকার যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করছে। এ দেশের স্বাধীনতার পর সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে গোষ্ঠিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কাযক্রম, মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচী, দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র, চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য, পরিবহন সুবিধা, কল্যাণ ভাতা ও যৌথ বীমার ব্যবস্থা অন্যতম। এর ফলে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ উপকৃত হচ্ছেন।

সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর ও বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিল বিভিন্ন

কল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এ সকল কর্মসূচী কর্মচারীদের কল্যাণে যে ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার জন্য এ প্রবন্ধে অবতারণা করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল এর বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা, কর্মসূচীগুলির সমস্যাসমূহ সম্পর্কে এ প্রবন্ধে কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে।

এ প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন অধ্যাদেশ, বিধিমালা, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, পরিপত্র, বিভিন্ন প্রতিবেদন ইত্যাদির সহায়তা নেয়া হয়েছে। এছাড়া সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর ও বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিলের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর কী কী কার্যক্রম/কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং এগুলোর সম্প্রসারণসহ আরো নতুন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় পর্যালোচনা করার জন্য এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতামত ও লেখকের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা সংকলনের মাধ্যমে প্রবন্ধটি সম্পন্ন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ লেখাটি কেন্দ্রে চলমান বুনিয়াদী কোর্স ও অন্যান্য কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের জন্য খুবই উপযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের ক্রমবিকাশ

সরকারী কর্মচারীগণ সমাজেরই অংশ বিশেষ। বাংলাদেশে প্রায় দশ লক্ষ সরকারী কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ নিয়ে একটা বৃহৎ অংশ সমস্যাগ্রস্ত হলে গোটা সরকার তথা সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা সমস্যাগ্রস্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বাধা প্রাপ্ত হবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণের মানসে সমাজে কল্যাণের দর্শানুনযায়ী আধুনিক বিশ্বের ন্যায় বিভিন্ন কল্যাণ কর্মসূচী চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

স্বাধীনতার পূর্বে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তার কর্মচারীদের জন্য পঞ্চাশের দশকে ঢাকা ও চট্রগ্রামে দুটো আঞ্চলিক কল্যাণ অফিস স্থাপন করে। এ দুটো আঞ্চলিক কার্যলয়ের মাধ্যমে সীমিত কর্মসূচীর দ্বারা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছিল। ১৯৬২ সালে

প্রাদেশিক সরকার সচিবালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের কল্যাণে কর্মসূচী চালুকল্পে এক আদেশ জারি করে কল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। প্রাদেশিক সরকারের এস, এন্ড, জি এ ডিপার্টমেন্টের অধীনে এ কার্যক্রম পরিচালিত হতো।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কল্যাণ কার্যক্রমকে একীভূত করে সরকার মন্ত্রী পরিষদ সবিচালয়ের সংস্থাপন বিভাগের অধীনে "সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সংস্থা" গঠন করে। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণ কর্মসূচী এ সংস্থার মাধ্যমে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। কল্যাণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ছিল অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ। সীমিত আকারের কর্মসূচী সময়ের চাহিদানুযায়ী সমস্যাগ্রস্ত কর্মচারীদের জন্য অপর্যাপ্ত বলে অনুভূত হবার কারণে সরকারী কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও চিত্তবিনোদন, শিক্ষা- চিকিৎসা এবং ষ্টাফ বাস স্কীমের ন্যায় কল্যাণ কর্মসূচীসহ নতুন নতুন কর্মসূচী চালুর মাধ্যমে কল্যাণ কার্যক্রম ব্যাপক ভিত্তিক করার জন্য সরকার ১৯৭৯ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে "সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর" নামে পূর্ণাঙ্গ পরিদপ্তর সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে এ পরিদপ্তরের মাধ্যেমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে সরকারী রাজস্ব বাজেটে নতুন নতুন কল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল সংক্রান্ত ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের ক্রমবিকাশ

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারকে ধারাবাহিকভাবে মাসিক কল্যাণ ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে পূর্ব পাকিস্তান সরকারী কর্মচারী কল্যাণ অধ্যাদেশ, ১৯৬৮(১৯৬৮ সালের অধ্যাদেশ নং -৩)এবং কোন কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে মৃত কর্মচারীর পরিবারকে এককালীন যৌথবীমার টাকা সাহায্য প্রদানের বিধান করে পূর্ব পাকিস্তান সরকারী কর্মচারী যৌথবীমা অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের অধ্যাদেশ নং -১১) জারী করা হয়।

একইভাবে তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ও কতিপয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের জন্য ধারাবাহিকভাবে মাসিক কল্যাণ ভাতা এবং এককালীন যৌথবীমার সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা সম্বলিত কেন্দ্রীয় কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা আইন,

১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের আইন নং ২) জারী করে। উল্লেখিত ৩ (তিন)টি আইনের ভিত্তিতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। উক্ত তিনটি বোর্ড স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করা হত। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী ও তাদের পরিবারের জন্য প্রবর্তিত সুযোগ-সুবিধা এবং চাঁদা ও প্রিমিয়ামের হার বিভিন্ন থাকায় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য একই রকমের সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তন এবং একই হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কিন্তু এর সাথে আইনগত জটিলতা ও আর্থিক বিষয় জড়িত থাকার কারণে ঐ বিষয়সমূহ পরীক্ষা করে একটি সমন্বিত আইন প্রণয়নে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি বোর্ড ২৪-১১-৮২ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্নভাবে কার্যপরিচালনা করে। সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনার্থে তিনটি ভিন্ন বোর্ডের স্থলে এককেন্দ্রিকভাবে কার্য পরিচালনার জন্য ২৫-১১-৮২ হতে সকল শ্রেণীর সরকারী ও কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও র্কমচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য একইরূপ সুবিধা প্রবর্তন করে উল্লেখিত ৩টি বোর্ডকে একীভূত করে সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল অধ্যাদেশ, ১৯৮২(১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ নং-৩৯) জারী করা হয়। এ অধ্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এস, আর, ও নং-৪২৩/এল/৮২, তারিখ ১৫-১২-১৯৮২ এর মাধ্যমে ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশটি ২৫-১১-৮২ হতে কার্যকর করা হয়। এস, আর,ও নং - ৩৯৬-এল/৮২ তারিখ ২৫-১১-৮২ এর মাধ্যমে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল নামে একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ বোর্ড পূর্বে উল্লেখিত ৩টি ভিন্ন বোর্ডের স্থলাভিষিক্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বোর্ডের আওতায় প্রজাতন্ত্রের অধীন সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে গণ্য।

সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

সরকারী কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনসহ বিভিন্ন প্রকার কল্যাণমূলক সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। এই পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এবং বরিশালে ৫টি অফিস রয়েছে। সিলেটে

বিভাগে এখনো এ পরিদপ্তরের অফিস স্থাপন করা হয়নি। চট্রগ্রামে বিভাগীয় অফিসের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে রাজস্ব খাতে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে যথাক্রমে ১০৭টি এবং ৪২টি পদ রয়েছে।

কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কল্যাণ কমিটি

সরকারী কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের রাজস্ব বাজেটে প্রতি বছর আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করা হয়। অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা একটি কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল পরিচালনার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রাণালয়ের সচিব এর সভাপতিত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কমিটি রয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়েও কল্যাণে তহবিল কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষাবৃত্তি ও চিকিৎসা সাহায্য উপ-কমিটি রয়েছে। এ সকল কমিটি গঠন প্রণালী পরিশিষ্ট-খ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম

(ক) গোষ্ঠি ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কার্যাবলী

১। ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা ঃ

সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন সরকারী আবাসিক এলাকায় ১৬টি স্থায়ী কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার বেইলী রোডে অবস্থিত অফিসার্স ক্লাব স্থাপনে সরকার আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে। বিভাগীয় শহর চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনায়ও একই ধরনের কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা শহরে ৫টি এবং বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ-এ একটি করে আরো ৮টি নতুন কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনের একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে নিম্নবর্ণিত সুযোগ সুবিধাদি প্রদান করা হয়ঃ

(১)সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপে সহযোগিতা প্রদান।

(২) মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ দান ও লাইব্রেরীতে পাঠ্য পুস্তকসহ বিভিন্ন বই পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(৩) কমিউনিটি সেন্টারের হলরুম বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার।

২। মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আত্ম-কর্মসংস্থান করে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সহায়তার জন্য সরকারী কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল মহিলা সম্প্রদায় তথা স্ত্রী-কন্যাগণকে তাদের পরিবারিক কাজের অবসরে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল মহিলাদের কাপড় সেলাই, কাটা-ছাটা, বুনন,. ফুলতোলা, টাইপিং (বাংলা ও ইংরেজী) ও শর্টহ্যান্ড নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলাই এ কার্যক্রমের মূল্য উদেশ্যে।

৩। দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

সরকারী মহিলা কর্মচারীগণ তাদের ০২ হতে ০৫ বছর বয়সের সন্তানের নিরাপদ স্থানে রেখে যাতে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সে জন্য সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রাণাধীনে ঢাকার বাংলাদেশ সচিবালয় সংলগ্ন এলাকায় ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৪। শরীরচর্চা/খেলাধুলার উন্নয়ন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন

সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর কর্মচারীদের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় শিশু পার্ক ও খেলার মাঠ নির্মাণ করে কর্মচারী ও তাদের ছেলে-মেয়েদের শরীরচর্চা ও খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারে অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা (ইনডোর গেম্‌স) যেমন ক্যারাম, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। ঢাকার অফিসার্স ক্লাবে একটি সুইমিং পুলও স্থাপন করা হয়েছে। ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারগুলিকে এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি বছর আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

সরকারী কর্মচারী ও তাদের ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখার লক্ষ্যে প্রতিবছর মহানগরী ঢাকা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতার দেশের সকল জেলা থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। এতে প্রতিযোগীদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন ছাড়াও তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসহ উদ্দীপনা ও প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রতিযোগিতার

বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদানের পাশাপাশি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ক্রীড়া পোষাক সরবরাহ করা হয়।

৫। অবসর বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন

বিশ্রাম মানুষের কাজের গতিকে তরান্বিত করে। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কঠোর পরিশ্রমের পর ক্লান্তি অবসাদ দূর করে মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য সাপ্তাহিক বা অন্যান্য ছুটির দিনে কর্মস্থানের বাইরে কোথাও গমন করে সময় কাটানো বা অবসর গ্রহণের জন্য কর্মস্থল থেকে কোথাও গিয়ে বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমানে ঢাকা বা অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা শহরে অবসর বিনোদনের সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। এছাড়া শুধু মাত্র সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য কোন বিনোদন কেন্দ্র নেই বললেই চলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা এবং বনভোজন ও অন্যান্য বিনোদমূলক ক্রীড়ার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুরে ৩.৩৫ একর জমির উপর একটি অবসর বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এই কেন্দ্রকে অর্থনৈতিক দিকে থেকে স্বাবলম্বী করার জন্য একটি নার্সারী কাম- ফলের বাগান প্রতিষ্ঠা ও একটি লেক খনন করে তাতে মাচ চাষের ব্যবস্থা করা হবে। একই উদ্দেশ্যে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত নিকটবর্তী স্থানে ২ একর জমির উপর একটি অবসর বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এ প্রসংঙ্গে উল্লেখ্য যে, গোষ্ঠি বিভিক্ত কল্যাণ কর্মসূচী যেমন- ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার, মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খেলাধুলা উন্নয়ন, ইত্যাদি পরিচালনার জন্য সরকার প্রতি বছর রাজস্ব খাতে অনুদান বরাদ্দ করে থাকে।

৬। দেশ-বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য

কোন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী অথবা তাদের স্ত্রী/স্বামী বা সন্তান জটিল রোগ যেমন, ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, কিডনী রোগ, যক্ষা, হৃদরোগ, পক্ষাঘাত এবং কৃত্রিম অংগ সংযোজন ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে পড়লে এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য অনেক সময় বিদেশে উন্নতমানের চিকিৎসা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের জটিল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা দেশে থাকলেও তা খুবই ব্যয়বহুল। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পক্ষে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এসব জটিল রোগের চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় তাদেরকে আর্থিক সহায়তা করার জন্য সরকার "দেশে- বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল"

নামে একটি সাহায্য তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ উদ্দেশ্য ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে ৩ (তিন) কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটেও এ খাতে একই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এ তহবিল থেকে একজন আবেদনকারীকে রোগের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী সবোর্চ্চ ১(এক) লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচীকে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যায়।

৭। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম

দীর্ঘদিন সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত থাকার পর অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা /কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে সরকার খুবই আগ্রহী। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণার্থে গঠিত "অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি"- এর বহুমুখী কল্যাণ প্রকল্পের জন্য প্রতি বছর সরকারী রাজস্ব বাজেটে অনুদান বরাদ্দ করা হয়। এ অনুদানের অর্থ দ্বারা সমিতি ঢাকা শহর ও জেলা পর্যায়ে শাখা সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা করে। সমিতির প্রধান কর্মকান্ডের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য মেডিকেয়ার সেন্টার স্থাপন, আয়বর্ধক প্রকল্প হিসেবে বহুতলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ, বয়স্কদের জন্য ক্রীড়া ও খেলাধুলার ব্যবস্থা, সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচী, শিক্ষাবৃত্তি, আর্থিক অনুদান ও পাঠাগার পরিচালনা ইত্যাদি অন্যতম।

(খ) আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম

১। শিক্ষা বৃত্তি

নিম্ন বেতনভুক্ত সরকারী কর্মচারীগণ তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় মিটাতে আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হন। এ আর্থিক সমস্যা লাঘবের জন্য ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা খাতে বৃত্তি প্রদানের জন্য সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরে একটি কার্যক্রম চালু রয়েছে। ১৯৭৮ সালে সরকারী রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত ১.০০(এক) কোটি টাকার অনুদানের অর্থে এ উদ্দেশ্যে একটি আবর্তক তহবিল গঠন করা হয়। শিক্ষাবৃত্তি লাভের জন্য সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে অধিক সংখ্যায় আবেদনপত্র পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ খাতে প্রতি বছর বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ করছে।

ডাক, তার ও টেলিফোন, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বি,ডি আর ও পুলিশ বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারীগণ ব্যতীত বেসামরিক হিসাব হতে বেতন গ্রহণকারী সকল নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারী তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি

পাওয়ার যোগ্য । একজন কর্মচারীকে অনধিক দুটি সন্তানের জন্য শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয়। শিক্ষাবৃত্তি লাভের জন্য সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রতি বছর নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের ফরম বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের সকল অফিস ও সকল জেলা প্রশাসকের অফিসে এ ফরম পাওয়া যায়। প্রতি বছরের শুরুতে সরকারী বিজ্ঞপ্তি, হ্যান্ডআউট, সংবাদপত্র ও রেডিও টেলিভিশনে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তির জন্য আবেদনপত্র আহবান করা হয়। ঢাকা মহানগরীতে কর্মরত কর্মচারীদের আবেদনপত্রসমূহ সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ও অন্যান্য স্থানে কর্মরত কর্মচারীদের আবেদনপত্র পরিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসে গ্রহণ করা হয়। কর্মচারীদের কাছ থেকে শিক্ষাবৃত্তির আবেদন ও বৃত্তি প্রদানের বিষয় বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবৃত্তি নির্বাচনী কমিটি ও আঞ্চলিক শিক্ষাবৃত্তি নির্বাচনী কমিটি রয়েছে।

২। চিকিৎসা সাহায্য

নন - গেজেটেড সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার ব্যয় মিটানোর জন্য আর্থিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্য ১৯৭৮ সনে একটি চিকিৎসা সাহায্য তহবিল চালু করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এবং তার পরিবারের সদস্য যারা তার সাথে একত্রে বসাবাস করেন এবং তার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল শুধুমাত্র তারাই এ তহবিল হতে সাহায্য পেতে পারেন। এ সাহায্য লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরের মাধ্যমে চিকিৎসকের প্রত্যায়নপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়। আবেদনকারীকে সর্বোচ্চ ২,০০০/- টাকা মঞ্জুর করা যায় । এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কল্যাণ তহবিল হতে সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় তা থেকে এ চিকিৎসা সাহায্য সম্পূর্ণ আলাদা।

৩। মৃত কর্মচারীদের দাফন-কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য

কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য দীর্ঘদদিন রোগ ভোগ, দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে মৃত্যুবরণ করলে তার দাফন-কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর কর্তৃক আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী যে স্থানে কর্মরত তথায় দাফন-কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ৩,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ কর্মস্থলের বাহিরে পরিবহনের জন্য পরিবহন ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত ২,০০০/ - টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

৪। সরকারী কর্মচারীদের পরিবহনের জন্য ষ্টাফ বাস প্রকল্প

সময়মত অফিসে আগমন ও পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধার মধ্যে একটি ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। সীমিত আয়ের সরকারী কর্মচারীগণ দূরদূরান্ত এলাকা থেকে অফিসে সময়মত যাতায়াতে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। ফলে স্বল্প ভাড়ায় সরকারী কর্মচারীদের সময়মত অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য "বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী কল্যাণ কমিটি" এর ০২-০৫-১৯৭৪ ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭৪ সালে ১টি বাস দ্বারা ষ্টাফ বাস সার্ভিস চালু করা হয়। পরবর্তীতে ষ্টাফ বাস স্কীমের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও স্কীমটি সম্প্রসারণের জন্য সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে-সরকার প্রায় প্রতি বৎসর রাজস্ব বাজেটে নতুন বাস ক্রয়ের জন্য অনুদান বরাদ্দ করে এবং এ অনুদানের টাকায় নতুন বাস ক্রয় করা হয়। ষ্টাফ বাস স্কীমের যানবাহনের সংখ্যা বর্তমানে ৪৬-এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে ৩৮টি বাস ও ৫টি মিনিবাস), চট্টগ্রামে বিভাগীয় সদরে ৩টি, রাজশাহী বিভাগীয় সদরে ২টি, খুলনা বিভাগীয় সদরে ১টি, বরিশাল সদরে ১টি ও রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় ১টিসহ মোট ৪৬টি বাস রয়েছে। ষ্টাফ বাস ব্যবহারকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে নামমাত্র ভাড়া অথ্যাৎ বড় বাস প্রতি মাইল .১৫ টাকা ও মিনিবাস প্রতিমাইল .৩০ টাকা হিসেবে আদায় করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে ষ্টাফ বাসে যাতায়াতকারী কর্মচারীদের নিকট হতে ভাড়া বাবদ ২১,৪২,৮৬০/-(একুশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত ষাট) টাকা আদায় হয়েছে। প্রধান কার্যলয়সহ বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালিত ষ্টাফ বাসের রুট সংখ্যা ৬৩টি। ঢাকা প্রধান কার্যলয়সহ বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালিত ষ্টাফ বাসের যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫,৫০০ জন । এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ঢাকা শহরের জনসংখ্যার চাপ হ্রাসকল্পে শহরতলীর বিভিন্ন এলাকা-যেমন গাজীপুর, ধামরাই, সাভার, মানিকগঞ্জ, টংগী, নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা, সোনারগাঁও ও নরসিংদিতে এ ষ্টাফ বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আরোও উল্লেখ্য যে, সরকারী বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী সভায় ও সেমিনারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারী যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ সচিবালয় হতে শেরে বাংলা নগরস্থ পরিকল্পনা কমিশন ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পর্যন্ত ৩০টি আসন বিশিষ্ট ১টি মিনিবাস দ্বারা বিনা ভাড়া 'সাটল সার্ভিস' চালু করা হয়েছে। মিনিবাসটি দৈনিক নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী ৪ বার যাওয়া আসা করে থাকে। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটি বা অন্যান্য সরকারী ছুটির দিনে ষ্টাফ বাসগুলিকে ভাড়া দেয়া হয়। এতে প্রকল্পটির আয় বৃদ্ধি হয়। ষ্টাফ বাস স্কীমটি পরিচালনার জন্য

ডিপ্লোমাধারী পরিবহন অফিসার, সুপারভাইজার, গাড়ী চালক, ষ্টোরকিপার, সহকারী কাম- মুদ্রাক্ষরিক, মেকানিক, টাইম-কিপার, টিকেট চেকার, হেলপার, দারোয়ান এর মোট ১০৭ টি পদ রয়েছে।

বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল এর সাংগঠনিক কাঠামো

সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল, অধ্যাদেশ ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ৩৯নং অধ্যাদেশ) এর বিধান অনুযায়ী গঠিত "সরকারী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল" পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ রয়েছে। এ বোর্ডের গঠন প্রণালী নিম্নরূপঃ

(১) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
(২) সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪) যুগ্ম-সচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫) হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ, ঢাকা	সদস্য
(৬) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	সদস্য
(৭) উপ-সচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮) পরিচালক, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর	সদস্য-সচিব

বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর অধীনে সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারী "কল্যাণ তহবিল" ও যৌথ বীমা তহবিল নামে দুটি তহবিল দুটির তহবিল আছে। কার্যক্রম আলাদা ভাবে পারিচালিত হয়।

কল্যাণ তহবিল কার্যক্রম

ক) তহবিল গঠন

সকল সরকারী ও ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার তালিকা, পরিশিষ্ট-গ এ দেখা যেতে পারে) ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ নং-৩৯) এর বিধান অনুযায়ী একটি কল্যাণ

তহবিল রয়েছে। এ তহবিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবমা তহবিল বিধিমালা, ১৯৮২ প্রণয়ন করা হয়েছে। অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ১৯৮২ সাল থেকে সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাছে থেকে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা হিসেবে মাসিক বেতনের এক শতাংশ সর্বোচ্চ ২০/- (বিশ টাকা) টাকা কর্তন করা হত। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বেতন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৮৭ সাল থেকে উল্লেখিত অধ্যাদেশ সংশোধন করে চাঁদা ৪০/- (চল্লিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে মাসিক কল্যাণ ভাতার হার এবং সময় সীমাও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

খ) চাঁদা আদায় ও সংরক্ষণ

সরকারী কর্মচারীদের মাসিক বেতন থেকে আদায়কৃত কল্যাণ তহবিলের চাঁদার হিসাব সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিস মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রেরণ করে। মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রক প্রতি মাসে হিসাব রক্ষণ অফিসসমূহ থেকে প্রাপ্ত চাঁদার অর্থ একত্রিত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক, রমনা শাখায় রক্ষিত কল্যাণ তহবিলের হিসাবে জমা দিয়ে থাকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীর বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাঁদা সংশ্লিষ্ট অর্থ নিয়ন্ত্রক কর্তৃক কল্যাণ তহবিলের অনুকূলে চেকের মাধ্যমে জমা দেয়া হয়। কল্যাণ তহবিলের আওতাভুক্ত ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের চাঁদা তাদের বেতন থেকে যথারীতি কর্তন করে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে কল্যাণ তহবিল অফিসে প্রেরণ করা হয় বা পরবর্তী সোনালী ব্যাংকে রক্ষিত হিসাবে জমা দেয়া হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারী চাঁদা ব্যতীত সরকার কর্তৃক ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর পর্যন্ত তহবিলের অনুকূলে প্রতি বছর ৩ (তিন লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হতো। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছর থেকে কল্যাণ তহবিলের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে না।

কল্যাণ তহবিল থেকে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাসমূহ

(ক) মাসিক কল্যাণ ভাতা

কোন কর্মকর্তা /কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় অথবা অবসর গ্রহণের পর অনধিক ১০ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে ধারাবাহিকভাবে প্রতি মাসে সর্বনিম্ন ২০০/- থেকে সর্বোচ্চ ১০০০/- হারে ১৫ বছর অথবা মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বয়স যে তারিখে ৬৭ বছর পূর্ণ হয় ঐ তারিখ পর্যন্ত কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতা জনিত কারণে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করলে অথবা অপসারিত হলে উক্ত

কর্মকর্তা/কর্মচারীকেও একই নিয়মে কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়। মাসিক কল্যাণ ভাতার হার হিসাব নিম্ন সারণীতে দেয়া হলো।

খ) চিকিৎসা ও অন্যান্য আর্থিক সংকটে সহায়তা

কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা তার পরিবারের কোন সদস্য জটিল বা দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা ব্যয় মিটানোর জন্য বা অন্য কোন কারণে চরম আর্থিক সংকটে পতিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তার মূলবেতনের কল্যাণ তহবিল থেকে সাহায্য হিসাবে প্রদান করা হয়। প্রতি আর্থিক বছরে একবার করে এ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

গ) কন্যার বিবাহে আর্থিক সাহায্য

নিম্ন বেতনভুক্ত সরকারী কর্মচারীগণ তাদের কন্যার বিবাহ প্রদানের সময় সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা ও অন্যান্য ব্যয় মিটানোর ক্ষেত্রে বিশেষ আর্থিক সংকটে পতিত হন। তাদেরকে সহায়তা প্রদান করার জন্য কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য হিসেবে প্রতি কন্যার বিবাহের জন্য ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হয়। সবোর্চ্চ মাসিক ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা মূলবেতন গ্রহণকারী কর্মচারীকে অনধিক দুই কন্যার বিবাহের জন্য এ সাহায্য দেয়া হয় । বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের ২৯-৬-৯৬ তারিখের সভায় মাসিক ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত বেতন গ্রহণকারীদেরকেও কন্যার বিবাহে সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঘ) শিক্ষাবৃত্তি

কোন কর্মকর্তা /কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে অথবা দৈহিক বা মানসিক কারণে অক্ষমতাহেতু চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করলে অথবা অপসারিত হলে অথবা স্বাভাবিক অবসর গ্রহণ করলে ঐ কর্মকর্তা/কর্মচারীর মৃত্যু, অপসারণ বা অবসর গ্রহণের ১০(দশ) বছর অর্থ্যাৎ তার বয়স যে দিন ৬৭ বছর পূর্ণ হবে /হতো সে সময় পর্যন্ত তাদের অনধিক ২টি সন্তানের লেখা পড়ার জন্য কল্যাণ তহবিল থেকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। নবম শ্রেণী হতে উপরের সকল শিক্ষা কোর্সের জন্য মাসিক ৭৫/- (পঁচাত্তর টাকা) হতে সর্বোচ্চ ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা) হারে এ বৃত্তি এককালিন মঞ্জুর করা হয়।

ধারাবাহিক কল্যাণ ভাতার হার (১৪-৫-১৯৮৭ হতে কার্যকরী)।

মূল বেতন	কল্যাণ ভাতার মাসিক হার (টাকা)
যার বেতন টাকা ৭০০ এর বেশী নহে	২০০/-
	২২৫/-
যার বেতন টাকা ৮০০ এর বেশী কিন্তু ৯০০ এর বেশী নয়	২৫০/-
যার বেতন টাকা ৯০০ এর বেশী কিন্তু ১০০০ এর বেশী নয়	২৭৫/-
যার বেতন টাকা ১০০০ এর বেশী কিন্তু ১১০০এর বেশী নয়	৩০০/-
যার বেতন টাকা ১১০০ এর বেশী কিন্তু ১২০০ এর বেশী নয়	৩২৫/-
যার বেতন টাকা ১২০০ এর বেশী কিন্তু ১৩০০ এর বেশী নয়	৩৫০/-
যার বেতন টাকা ১৩০০ এর বেশী কিন্তু ১৪০০ এর বেশী নয়	৩৭৫/-
যার বেতন টাকা ১৪০০ এর বেশী কিন্তু ১৫০০ এর বেশী নয়	৪০০/-
যার বেতন টাকা ১৫০০ এর বেশী কিন্তু ১৬০০এর বেশী নয়	৪২৫/-
যার বেতন টাকা ১৬০০ এর বেশী কিন্তু ১৭০০ এর বেশী নয়	৪৫০/-
যার বেতন টাকা ১৭০০ এর বেশী কিন্তু ১৮০০ এর বেশী নয়	৪৭৫/-
যার বেতন টাকা ১৮০০ এর বেশী কিন্তু ১৯০০ এর বেশী নয়	৫০০/-
যার বেতন টাকা ১৯০০ এর বেশী কিন্তু ২০০০ এর বেশী নয়	৫২৫/-
যার বেতন টাকা ২০০০ এর বেশী কিন্তু ২১০০ এর বেশী নয়	৫৫০/-
যার বেতন টাকা ২১০০ এর বেশী কিন্তু ২২০০ এর বেশী নয়	৫৭৫/-
যার বেতন টাকা ২২০০ এর বেশী কিন্তু ২৩০০ এর বেশী নয়	৬০০/-
যার বেতন টাকা ২৩০০ এর বেশী কিন্তু ২৪০০ এর বেশী নয়	৬২৫/-
যার বেতন টাকা ২৪০০ এর বেশী কিন্তু ২৫০০ এর বেশী নয়	৬৫০/-
যার বেতন টাকা ২৫০০ এর বেশী কিন্তু ২৬০০ এর বেশী নয়	৬৭৫/-
যার বেতন টাকা ২৬০০ এর বেশী কিন্তু ২৭০০ এর বেশী নয়	৭০০/-
যার বেতন টাকা ২৭০০ এর বেশী কিন্তু ২৮০০ এর বেশী নয়	৭২৫/-
যার বেতন টাকা ২৮০০ এর বেশী কিন্তু ২৯০০ এর বেশী নয়	৭৫০/-
যার বেতন টাকা ২৯০০ এর বেশী কিন্তু ৩০০০ এর বেশী নয়	৭৭৫/-
যার বেতন টাকা ৩০০০ এর বেশী কিন্তু ৩১০০ এর বেশী নয়	৮০০/-
যার বেতন টাকা ৩১০০ এর বেশী কিন্তু ৩২০০ এর বেশী নয়	৮২৫/-
যার বেতন টাকা ৩২০০ এর বেশী কিন্তু ৩৩০০ এর বেশী নয়	৮৫০/-
যার বেতন টাকা ৩৩০০ এর বেশী কিন্তু ৩৪০০ এর বেশী নয়	৮৭৫/-
যার বেতন টাকা ৩৪০০ এর বেশী কিন্তু ৩৫০০ এর বেশী নয়	৯০০/-
যার বেতন টাকা ৩৫০০ এর বেশী কিন্তু ৩৬০০ এর বেশী নয়	৯২৫/-
যার বেতন টাকা ৩৬০০ এর বেশী কিন্তু ৩৭০০ এর বেশী নয়	৯৫০/-
যার বেতন টাকা ৩৭০০ এর বেশী কিন্তু ৩৮০০ এর বেশী নয়	৯৭৫/-
যার বেতন টাকা ৩৮০০ এর উর্ধ্বে	১০০০/-

ঙ) যৌথ বীমা তহবিল গঠন

সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের অধ্যাদেশ নং - ৩৯) এর বিধান অনুযায়ী সকল সরকারী ও ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে যৌথবীমার সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি যৌথ তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল পরিচালনার জন্য

উল্লিখিত অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিল বিধিমালা, ১৯৮২ প্রণয়ন করা হয়েছে। অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক মূলবেতনের ০.৭০% হারে সবোর্চ্চ ১৪/- (চৌদ্দ) টাকা যৌথবীমার প্রিমিয়াম হিসেবে আদায় করা হত। ১৯৮৫ সনে নতুন বেতন স্কেল প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বেতন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ সংশোধন করে যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার ০.৭০% বহাল রেখে ৩০/- (ত্রিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং বীমার অর্থের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়।

চ) চাঁদা আদায় ও সংরক্ষণ

১৯৮২ সনের কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিল অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী গেজেটেড কর্মকর্তার মাসিক বেতন বিল হতে প্রিমিয়াম কর্তন করা হয় এবং উক্ত প্রিমিয়াম মহা হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস হতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে যৌথবীমার তহবিলের হিসাব জমা হয়ে থাকে। নন-গেজেটেড কর্মচারীদের প্রিমিয়াম নির্ধারিত হারে সরকার যৌথবীমা তহবিলের অনকূরে প্রতি অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

ছ) যৌথবীমার দাবী পরিশোধ

কোন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারের সদস্য বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে মৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর শেষ বেতনের ২৪ মাসের সম পরিমাণ অর্থ অনুর্ধ্ব ১.০০ (এক লক্ষ) টাকা যৌথবীমার দাবী হিসাবে পরিশোধ করা হয়। যৌথবীমার অর্থ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, যৌথবীমার তহবিল অফিসে সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। আবেদন পত্র পাওয়ার পর দাবীর কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বোর্ডের সচিব এর অনুমোদনক্রমে বীমার টাকা মঞ্জুর পূর্বক চেক/ব্যাংক ড্রাফট আকারে সংশ্লিষ্ট অফিসের মাধ্যমে প্রাপক / প্রাপিকার নিকট পাঠানো হয়।

কল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পির্কিত সুপারিশ

১) জেলা পর্যায়ে অফিস প্রতিষ্ঠাঃ জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন করে কল্যাণমূলক কর্মসূচী সুবিধা সূদুর প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত কর্মচারীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য জরুরী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

২) আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধিঃ সরকারী কর্মচারীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনসহ অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান এবং নানাবিধ সমস্যা সমাধান কল্পে সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর এর বিভিন্ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য অধিক আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন। এ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলে শিক্ষা বৃত্তি চিকিৎসা, দাফন-কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বরাদ্দের হার বাড়ানো সম্ভব হবে। এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে কর্মচারীদের দপ্তরে যাতায়াতের সুবিধার্থে ষ্টাফ বাস সংখ্যা ও সেবা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

৩) সরকারী কর্মচারীদের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল স্থাপনঃ সরকারী কর্মচারীদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকার ফুলবাড়িয়ায় অবস্থিত রেলওয়ে হাসপাতালের পরিত্যক্ত ভবনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি হাসপাতাল রয়েছে। উক্ত হাসপাতালটিকে উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে বর্দ্ধিতকরণ এবং সুচিকিৎসার জন্য সর্বপ্রকার সরঞ্জামাদি সরবরাহসহ একটি আধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত থাকলেও ন্যূনতম সুচিকিৎসার জন্য কোন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়নি। অন্যদিকে, হাসপাতালে একটি পুরাতন এক্সরে মেশিন এবং এনেসথেসিয়া মেশিন আছে যা প্রায়শঃই বিকল অবস্থায় থাকে। ফলে, অপারেশন বা অন্য কোন রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না এবং সরকারী কর্মচারীগণ এ হাসপাতাল থেকে আধুনিক ও সুচিকিৎসা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও পুলিশ, বিডিআর সদস্যদের জন্য আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক হাসপাতাল রয়েছে যা থেকে তারা সকল ধরনের চিকিৎসা সুবিধা লাভ করে থাকে। ঐ সকল সংস্থার কর্মচারীদের ন্যায় সরকারী কর্মচারীদের জন্য একটি আলাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। এ অবস্থায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন বর্তমান হাসপাতালটিকে সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করে একে আধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। আধুনিক যন্ত্রপাতির সমাহারসহ সাধারণ চিকিৎসা, সার্জিক্যাল বিভাগ, নাক-কান-গলা বিভাগ, কিডনী বিভাগ, গাইনী বিভাগ, হৃদরোগ বিভাগ, ডায়াবেটিকস বিভাগ, বক্ষব্যাধি বিভাগ, শিশু বিভাগ, ইমার্জেন্সী বিভাগ ও অন্যান্য সকল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা এ হাসপাতালে করা যেতে পারে। এছাড়া এ হাসপাতালে সর্বাধুনিক মানের যন্ত্রপাতিসহ অপারেশন থিয়েটার, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী থাকবে এবং প্রত্যেক বিভাগের কেবিন ও ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত বেড (অন্ততঃ ২০০ বেড) এর ব্যবস্থা থাকবে। এতে সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের কাঙ্ক্ষিত সুচিকিৎসার সুযোগ লাভে সক্ষম হবেন।

৪) দেশ- বিদেশে জটিল রোগের চিকিৎসা সাহায্যঃ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দেশে-বিদেশে জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য বর্তমানে রাজস্ব বাজেটে ৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ চিকিৎসা ব্যয় মিটানোর জন্য প্রতি আবেদনকারীকে সর্বোচ্চ ১.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রায় ১০(দশ) লক্ষ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে এ ধরনের আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা অনেক বেশী । এ অবস্থায় বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অতএব, এ খাতে রাজস্ব বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ অন্ততঃ দ্বিগুণ করা উচিৎ । এছাড়া বিদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যের সবোর্চ্চ পরিমাণ ১.০০ লক্ষ টাকা থেকে ২.০০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করার বিষয়ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকেও বিদেশে জটিল রোগের চিকিৎসা সাহায্যের আওতায় আনা প্রয়োজন।

৫) হাউজিং প্রকল্পঃ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাতে স্বল্প মূল্যে আবাসিক প্লট বরাদ্দ দেয়া যায় তার জন্য সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের অধীনে কল্যাণধর্মী হাউজিং প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। ঢাকা মহানগরীর নিকটবর্তী গাজীপুর জেলায় ও সাভারে সরকারী খাস জমি সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের অনুকূলে নামমাত্র মূল্যে বরাদ্দ করে উক্ত জমির উন্নয়ন ও প্লট তৈরী করে তা সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বরাদ্দ করা যেতে পারে। এতে সীমিত আয়ের সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে প্লট বরাদ্দ করা সম্ভব হবে এবং তাদের আবাসিক সমস্যা অনেকাংশে নিরসন হবে।

কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল সম্পর্কিত কতিপয় সুপারিশ

১) বিভাগীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণঃ বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা থেকে কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রম ও যৌথবীমা তহবিলের কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। বিভাগীয় বা জেলা পর্যায়ে এর কোন অফিস নেই। ফলে, এ তহবিল থেকে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য আবেদনকারীগণ যারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন তাদের পক্ষে কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে যোগযোগের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সরকার বর্তমানে কাজকর্ম বিকেন্দ্রীকরণ তথা জনগণের দ্বার প্রান্তে পৌঁছানের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রমকেও প্রাথমিক ভাবে বিভাগীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা

যেতে পারে। এতে জেলা/বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের বর্তমানে অসুবিধা অনেকাংশে লাঘব হবে।

২) ভাতার হার ও মেয়াদ বৃদ্ধিঃ বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন যাত্রার ব্যয় এর তুলনায় কল্যাণ ভাতা ও যৌথবীমা তহবিলের বর্তমান হার অপ্রতুল । এ হারকে যুক্তিসংগত পর্যায়ে অর্থ্যাৎ অন্ততঃ দ্বিগুণ করা প্রয়োজন।

৩) হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সহজ ও আধুনিকায়নঃ কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিলের বর্তমান হিসাব সাধারণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। এ দু' তহবিল হতে প্রতি বছর গড়ে ৫০ কোটি টাকা বিভিন্ন কার্যক্রমের অধীনে কর্মচারীদের প্রদান করা হয়। এ বিরাট অংকের হিসাব আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিলে কম্পিউটার স্থাপন করা অতীব প্রয়োজন।

৪) স্বাস্থ্য বীমা স্কীমঃ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অনেক সময় নানাবিধ জটিল ও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু তাদের পক্ষে ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা ব্যয় বহন সম্ভব নয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি স্বাস্থ্য বীমা চালু করার বিষয়ে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়। সরকারী কর্মকতা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যে স্বাস্থ্য বীমা স্কীম জরুরী ভিত্তিতে চালু করা প্রয়োজন।

উপসংহার

দেশের প্রশাসনিক উন্নয়নে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় সমৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ এর প্রতি সরকারী পর্যায়ে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কল্যাণ পরিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন কল্যাণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে গোষ্ঠি ভিত্তিক কল্যাণ কার্যক্রম , মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, চিকিৎসা ও অন্যান্য আর্থিক সংকটে সাহায্য, শিক্ষাবৃত্তি, পরিবহন সুবিধা, মাসিক কল্যাণ ভাতা ও যৌথ বীমা সুবিধা প্রদান অন্যতম। এ সকল কাযক্রম সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের উপর পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদন রাখছে। তবে, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির

পরিপ্রেক্ষিতে এখন যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয় তা' প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ পরিপ্রেক্ষিতে কার্যক্রমগুলোর জন্য আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অধিক হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সমস্যার সমাধানে হাউজিং প্রকল্প গ্রহণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল স্থাপন ও কল্যাণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুবিধার্থে প্রতি জেলায় কল্যাণ পরিদপ্তরের অফিস ও বিভাগীয় পর্যায়ে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথ বীমা তহবিল এর অফিস স্থাপন করা প্রয়োজন। এ সকল বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত জাতীয় উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী অবদান রাখাবে।

পরিশিষ্ট-ক

বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রেণী ভিত্তিক জনশক্তির পরিসংখ্যান

(৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ পর্যন্ত)

	মন্ত্রণালয়/বিভাগ অনুমোদিত পদ	অধিদপ্তর/পরিদপ্তর /দপ্তর সমূহের অনুমোদিত পদ	স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্পোরেশনসমূহের অনুমোদিত পদ	মোট অনুমোদিত পদ
১ম শ্রেণী	২৩৩৩	৪৫,৬২৭	৫১,০১৭	৯৯,০৩১
২য় শ্রেণী	১০৮	১৭,৮৫২	২৮,৮৯১	৪৬,৮৫১
৩য় শ্রেণী	৪৭৬৭	৫,১৬,৮০৯	১,৩৯,৫২২	৬,৬১,০৯৮
৪র্থ শ্রেণী	২৮১৯	১,৩৯,৮০২	১,০২,৯১৮	২,৪৫,৫৩৯
সর্বশেষ	১০,০২৭	৭,২০,০৯০	৩,২২,৪০২	১০,৫২,৫১৯

উৎস ঃ পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা উইং স্থাপন মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট-খ

(১) বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী কল্যাণ কমিটি (কেন্দ্রীয়

১.সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় -চেয়ারম্যন
২.অতিরিঃ সচিব সংস্থাপন মন্ত্রণালয় -ভাইস চেয়ারম্যান
৩.প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর -সদস্য
৪.যুগ্ম- সচিব (প্রঃ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় -সদস্য
৫. যুগ্ম -সচিব, বাজেট অনুবিভাগ (অর্থ বিভাগ) অর্থ মন্ত্রণালয় -সদস্য
৬. মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা -সদস্য
৭. মহা -পরিচালক, স্বাস্থ্য, অধিদপ্তর -সদস্য
৮. মহা-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর -সদস্য
৯. মহা-পরিচালক, পরিঃ পরিঃ অধিদপ্তর -সদস্য
১০. সেকশন চীফ, লোক প্রশাসন শাখা -সদস্য
১১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা -সদস্য
১২. আঞ্চলিক কল্যাণ কমিটিসমূহের চেয়ারম্যান -সদস্য
১৩. উপ-পরিচালক, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট -সদস্য
১৪. উপ-পরিচালক, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর, বিভাগীয় কার্য্যালয়সমূহ -সদস্য
১৫. সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ২ জন কর্মচারী প্রতিনিধি (১জন ৩য় শ্রেণীর ও ১জন ৪র্থ শ্রেণীর) -সদস্য
১৬. পরিচালক, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় -সদস্য-সচিব

(২) আঞ্চলিক কল্যাণ কমিটি

১. বিভাগীয় কমিশনার -চেয়ারম্যান
২. অতিঃ বিভাগীয় কমিশনার -ভাইস-চেয়ারম্যান
৩. জেলা প্রশাসকগণ -সদস্য
৪. পরিচালক, পরিঃ পরিঃ অধিদপ্তর -সদস্য
৫. উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর -সদস্য
৬. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা-অধিদপ্তর -সদস্য
৭. উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর -সদস্য
৮. কালেক্টর, শুল্ক, অবগারী ও ভ্যাট -সদস্য
৯. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিঃ -সদস্য
১০. কমিশনার কর্তৃক মনোনীত ২জন কর্মচারী প্রতিনিধি (১জন ৩য় শ্রেণী ও ১ জন ৪র্থ শ্রেণী) -সদস্য
১১. উপ-পরিচালক, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর, -সদস্য সচিব
বিভাগীয় কায্যালয়সমূহ -সদস্য সচিব

(৩) কেন্দ্রীয় শিক্ষাবৃত্তি ও চিকিৎসা সাহায্য উপ-কমিটি

১. যুগ্ম - সচিব (প্রঃ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয় -সভাপতি
২. অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপ-সচিব) পদমর্যদা সম্পন্ন) -সদস্য
৩. উপ-সচিব (সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয় - সদস্য
৪. শিক্ষা মন্ত্রণালায়ের একজন প্রতিনিধি - সদস্য
৫. সিভিল সার্জন, বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক অথবা তার প্রতিনিধি (মেডিক্যাল অফিসার পদমর্যাদা সম্পন্ন) -সদস্য
৬. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সংস্থান মন্ত্রণালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। -সদস্য
৭. ৩য় শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণের একজন প্রতিনিধি (সংস্থাপন মন্ত্রনালয় কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য
৮. ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণের একজন প্রতিনিধি (সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য
৯. পরিচালক, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর। -সদস্য-সচিব

(৪) আঞ্চলিক শিক্ষাবৃত্তি ও চিকিৎসা সাহায্য উপ-কমিটি

১. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার -সভাপতি
২. উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক কার্য্যালয় -সদস্য
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর অথবা তাহার প্রতিনিধি
(সহাকারী পরিচালক পদমর্যদা সম্পন্ন) -সদস্য
৩. উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
বিভাগীয় কার্যল্যায় অথবা তাহার প্রতিনিধি
(সহকারী পরিচালক পদমর্যদা সম্পন্ন) -সদস্য
৪. আঞ্চলিক হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা -সদস্য
৫. ৩য় শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণের -সদস্য
একজন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)
৬. ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী গণের -সদস্য
একজন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)
৭. উপ-পরিচালক, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর -সদস্য-সচিব

(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কেবলমাত্র শিক্ষাবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত সভায় এবং সিভিল সার্জন বা তার প্রতিনিধি কেবলমাত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত সভায় উপস্থিত থাকবেন)

পরিশিষ্ট -গ

বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর অধীনে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নামের তালিকা

১। বাংলাদেশ ট্রেডিং করপোরেশন (টি,সি,বি)
২। বাংলাদেশ চা বোর্ড;
৩। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ গবেষণাগার,
৪। বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন
৫। বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ,
৬। বাংলাদেশ হোমিও প্যাথি চিকিৎসা বোর্ড,
৭। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র,
৮। সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল ট্রাষ্টি।
৯। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো
১০। মংলা বন্দর কর্তপক্ষ (কেবলমাত্র প্রাক্তণ চালনা এ্যাংকোরেজ এর কর্মচারীদের জন্য),
১১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা যাদুঘর
১২। বাংলাদেশ ফার্মেসী পরিষদ,
১৩। গৃহ নির্মাণ গবেষণা ইনষ্টিটিউট,
১৪। আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থা।

১৫। পারমানবিক কৃষি ইনষ্টিটিউট
১৬। ক্যাডেট কলেজসমূহ
১৭। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং
১৮। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

তথ্য নির্দেশিকা

আকবর, মুহাম্মদ আলী (১৯৮০) আধুনিক সমাজ ক্যল্যাণের দর্শন ও মূল্যবোধ। *সমাজ কর্ম সাময়িকী*। রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

খান, বজলুর রশীদ (১৯৯৬) সরকারী কর্মচারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কল্যাণ পরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমঃ সমস্যা ও সমাধান(অপ্রকাশিত)। ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৬) সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিলের বার্ষিক বিবরণী (অপ্রকাশিত)। ঢাকাঃ বোর্ডি অব ট্রাষ্টিজ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৬) বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৪-৯৫। ঢাকাঃ সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৫) আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন/ বিধিমালা, ঢাকা।

তালুকদার, মোঃ আবদুল (১৯৯৯) *সমাজ কল্যাণ পরিচিতি*। ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী।

Chowdhury D. Paul (1996*) Profile of Social Welfre and Developement* in India. New Delhi:M.N. Publishers.

Department of Health Education and Welfare (1965*) Soial Welfare in a Changing World.* Washington D.C.t-VII.

Encyclopaedia of Social Work (1965) The National Assoiation of Social Workers of U,S,A, New York.

GoB (1996) Statics of Civil officers and Staff of the Government of the people's Republic of Bangladesh. Dhaka: M/O Establishment.

Intorduction to Social Welfare (1967) 2nd edition. New Delhil:Prentice Hall.

Report of the Task Force on Bangladesh Development strategies for the 1990's vol,1.p104.Dhaka:UPL

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
পঞ্চদশ সংখ্যা,
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

তাহারা শহরঃ উন্নয়নের একটি অনুকরণীয় মডেল

আয়েশা আজিম*

Tahara City: A Model for Development . Ayesha Azim

Abstract. This article is written on the basis of personal experience of the author during her visit to Japan. Tahara is an agricultural city. It has nine administrative units. Each of the units is headed by District "Sodai" Under these nine district units there are 58 smaller units which are termed as Wards. Each Ward ranges from 1500 to 1700 households. the present administrative set up of Tahara-cho is a result of several amalgamation of various small towns and communities since 1892. After early 1960 specialised farms on agriculture started in Tahara within very short time. This area is welknown in Japan for its extremely high farm income level. Similarly, growth and development of Tahara,s in dustrial sector is a typical example of an area's strong urban rural link ages, which could be described as growth of the industrial sector. The concept of decentralization upto grass root level is put in to practice at Tahara-cho, culminating in a sustained relationship between people and the government which is worth emulating by developing countries. So it may be suggested that Tahara-cho's institutional set up, administrative mechanism. devolution of authority, finacial policy, participatory system, sense of unity fair relationship of authority with local people and their appreciation for each other, desire for perfection and ever increasing appetite for development can be taken as model by any development country.

পৃথিবীর বুকে জাপান একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। এদেশের লোকের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত ও গৌরবময়। তাহারা চো অর্থাৎ তাহারা শহর জাপানের একটি কৃষি প্রধান শহর । অতি অল্প সময়ে শহরটি কিভাবে উন্নয়নের চরম শিখায় পৌছিয়েছে এবং উন্নয়নের জন্য যে সব কৌশলাদি গ্রহণ করেছে তা এ প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হলো। এ শহর উন্নয়নে যে সব কলাকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, তা যে কোন উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনুসরণীয় ও গ্রহণীয় হতে পারে। জাপানের এই চমৎকার শহরটির চারিদিকে সবুজের খেলা যা সচারাচর জাপানে দেখা যায় না। এধরনের সবুজ শহরের সংখ্যা জাপানে বেশ কম। জাপানের আইচিপ্রিপেকচারের সর্বদক্ষিণে এই শহরটির অবস্থান। এ শহরটি দক্ষিণে সুবিশাল প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে আটসুমি ও আকবেন শহর এবং পূর্বে তায়াহাসি শহর দ্বারা বেষ্টিত । তাহারার পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ২০০ হতে ৩০০ পাহাড়ের সারি, জাপানের আকাশ পাহাড়ের রেঞ্জের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে । তাহারা শহরের আয়তন ৮২.৩৬ বর্গমাইল। পূর্ব হতে পশ্চিমে বিস্তৃত ১৪.৩ বর্গমাইল এবং দক্ষিণ হতে উত্তরে ১০.৭ বর্গমাইল। ১৯৮৮ সালের হিসেব মতে ৯৪৫৩টি থানা নিয়ে গঠিত এই তাহারা শহরের লোক সংখ্যা

* এমডিএস, বিপিএটিসি।

৩৩০০০ হাজার। শহরের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। শীতের সময় ও একই আবহাওয়া এবং এই আবহাওয়া কৃষি কাজের উপযোগী।

তাহারা শহর অফিস একটি স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকারের সংস্থা, এই সংস্থা তার নিজস্ব মেয়র এবং টাউন কাউন্সিল নির্বাচন করে থাকে। মেয়রের অধীনে প্রশাসনিক দপ্তর, অর্থদান, শিল্পায়ন, শিক্ষা ও অন্যান্য সেবাদান ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। তাহারা শহরের নিয়োজন কাঠামো অনুযায়ী অস্থায়ী কৃষিজাত শিল্প কারাখানায় নিয়োজিত ৩৩%, প্রক্রিয়াজাত শিল্প কারখানায় নিয়োজিত ৩১% এবং সেবামূলক শিল্প কারখানায় নিয়োজিত ৩৩%।

শহরের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক

একটি শহর উন্নয়নে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সংস্থাসমূহ এবং এর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কিভাবে আরো গতিশীল করা যায় তার পথ খুঁজে বের করার আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে উন্নয়নে জনগণের করণীয় কর্তব্যসমূহের সঠিকভাবে পালন; দক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থার কৌশলাদি অর্জন; স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের কর্তব্যে সততা ও দক্ষতা; কৃষি উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নতমান কৃষি উৎপাদন ও এর বাজারজাত করণের জন্য সঠিক বিতরণ ব্যবস্থা গ্রহণ; শহরের ভবিষ্যত সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা ও ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জসমূহের মোকবেলার পন্থা নির্ধারণ; কৃষি সমবায় সমিতিগুলোর একতা এবং এদের করণীয় কর্তব্যসমূহ; শিল্প উন্নয়নের কলা কৌশলাদি গ্রহণ এবং শহরের পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ প্রণয়ন।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা ও জনগণের অংশগ্রহণ

বর্তমান তাহারা শহরটি ১৮৯২ সাল হতে ছোট ছোট সমাজ বা কমিনিউটির একত্রীভূতকরণের পরিবর্তন ও বিবর্তনের রূপ। ১৯৫৫ সালে তাহারা শহরের সাথে তিয়াহাসি নামে আরেকটি শহরের দুটি সমাজকে একত্রে সংযুক্ত করা হয়। সাধারণত প্রশাসন এ ধরনের কতগুলো সমাজকে একত্রিত করে একটি বড় ধরনের সমাজ গড়ে তোলে। জাপানে সরকারের প্রয়োজনে ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে যে কোন সময় এ ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। এটি জাপান সরকারের প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ ধরনের কাজে জনগণ সক্রিয়ভাবে সহযোগিতার সাথে অংশগ্রহণ করে থাকে।

তাহারার বর্তমান অনানুষ্ঠানিক প্রশাসন ব্যবস্থায় ৯টি প্রশাসনিক ইউনিটি রয়েছে। প্রত্যেকটি ইউনিটি একজন জেলা সোদাই দ্বারা পরিচালিত। জেলা সোদাই এই

প্রত্যেকটি ইউনিটের কর্মকান্ড সম্পাদনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে থাকে এবং উল্লিখিত ব্যক্তিরা স্থানীয় সরকার এর উন্নয়নমূলক কাজে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করে থাকে। উক্ত শহরে উল্লিখিত ৯টি ইউনিটের অধীনে ৫৮টি ছোট ছোট ইউনিট রয়েছে। এই ইউনিটগুলোকে ওয়ার্ড বলা হয়। আবার প্রত্যেকটি ওয়ার্ড একজন ওয়ার্ড সোদাই দ্বারা পরিচালিত। এসব ওয়ার্ডগুলো ১৫ হতে ১৭০০ টি পর্যন্ত থানা বা বাড়ী নিয়ে সংগঠিত। সোদাই এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছেঃ সমাজ এবং স্থানীয় সরকার সংস্থার সাথে যোগযোগ বজায় রাখা। সোদাই উল্লিখিত দুই দলের মধ্যে যোগাযোগের সেতু বন্ধনকারী হিসেবে গণ্য। তিনি সরকারের আদেশ, উপদেশ তার এলাকার লোকদের কাছে পৌছে দেন এবং একই ভাবে জনগণের মতামত ও প্রতিক্রিয়া তিনি সরকারের কাছে পৌছে দেন। সোদাই এর ভূমিকা হচ্ছে এই কাজ যোগ্যতার সাথে সম্পন্ন করা। তিনি তার দায়িত্ব বলিষ্ঠ নেতৃত্বের (জেলা ও ওয়ার্ডে) সাথে সম্পন্ন করে থাকেন। সোদাইদের ৬টি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছেঃ

(ক) সরকার প্রদত্ত ফরম জোগাড় করে তা জনগণ কর্তৃক পূরণ করে স্থানীয় অফিসে সঠিক সময়ে জমা দেয়া;

(খ) সরকার ও জনসাধারণের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা;

(গ) সরকারের আদেশ, উপদেশ ও তথ্যবলী সঠিকভাবে জনগণের কাছে পৌছে দেয়া;

(ঘ) স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় সরকারের সাথে জনগণের স্বার্থে ভূমিদখল সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে মধ্যস্থতা করে সহযোগিতার সাথে কাজ সম্পন্ন করা;

(ঙ) সরকার তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে জনগণের জন্য কোন প্রশ্নমালা তৈরী করলে সেগুলোর সুষ্ঠু বিলি নিশ্চিতকরণ;

(চ) গাড়ী চালানোর ব্যাপারে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সংশ্লিষ্ট জনগণকে এ ব্যাপারে উপদেশ দান।

অন্যদিকে স্থানীয় সমাজের জনগণ সোদাই এর প্রতি সব দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তা হলোঃ স্থানীয় সরকারকে রাস্তাঘাট, পুল ইত্যাদি তৈরী বা উন্নয়নের জন্য অনুরোধ করা, ট্রাফিক নিরাপত্তার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণের জন্য অনুরোধ জানানো, জনগণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম যথাঃ খেলাধুলার সুবিধা বৃদ্ধি, পার্ক তৈরী ইত্যাদি কার্যাদির জন্য সরকারকে অনুরোধ করা, পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সরকারকে অনুরোধ যথাঃ সুষ্ঠু পয়ঃ প্রণালীর ব্যবস্থা করে সমাজে সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি।

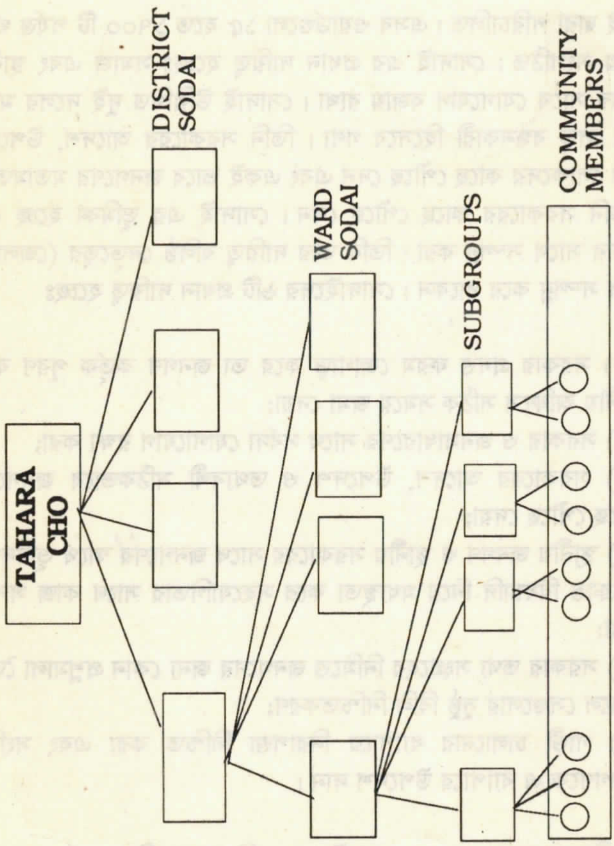

চিত্র-১ ঃ তাহারা শহরের স্থানীয় সরকার কাঠামো

কেন্দ্রীয়, প্রিফেকচারেল এবং মিউনিসিপ্যাল সরকারের মধ্যে উল্লিখিত যোগাযোগের তাৎপর্য হলোঃ উল্লিখিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাহেতু নিম্ন-উচ্চ সমন্বিত পদ্ধতি পরিকল্পনা ও প্রশাসনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। 'সোদাই' এর মধ্যস্থতায় স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সহমর্মিতা ও একটা সুষ্ঠু যোগাযোগ এর সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের সৌহার্দতা ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ হেতু স্থানীয় সরকারের প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজকর্মে কৃতকার্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকার

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের যথাঃ কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান তা হলো তাহারার স্থানীয় সরকারের (১) অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা ও (২) উন্নয়ন প্রকল্পে জনগণের অংশগ্রহণ। নিম্নে তার বিবরণী দেয়া হলোঃ

(১) অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা

সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ডে সরকার দ্বৈত বা এর অধিক পর্যায়ে যৌথভাবে অর্থায়ন করে থাকে। কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক (প্রিফেকচার) সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকারকে ভর্তুকি প্রদান করা হয় এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য স্থানীয় সরকারকে বেতন প্রদান করা হয়। বর্তমানে তাহারা শহরটি সর্বক্ষেত্রে উন্নত। এটিকে একটি স্বনির্ভর শহর বলা যায়। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক ভর্তুকি দান বা (সাবসিডি) ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এই শহরের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধির একমাত্র কারণ সরকারের ও জনগণের মধ্যে উন্নয়নের সম্মিলিত সহযোগিতা, সমঝোতা ও সহমর্মিতা।

(২) তয়োগা পানির চেনেল প্রকল্প

বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা ও কৃতকার্যকারিতার উদাহরণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যায় তয়োগা পানির চেনেল প্রকল্প এর নাম। এই চেনেল তৈরী করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের উপর। কেন্দ্রীয় সরকার তয়োগা পানির চেনেলটির কাঠামো গড়ে তোলে, অন্যদিকে আঞ্চলিক সরকার সব প্রকল্পের শাখা প্রশাখা বিস্তারের জন্য কাঠামোগতভাবে সাহায্য করে। স্থানীয় সরকারের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল চাষের উপযোগী জমি খুঁজে বের করা ও সেগুলোকে চাষের উপযোগী করার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণ করা। এভাবে সুপরিকল্পিত ও সম্মিলিতভাবে উল্লিখিত বিখ্যাত তয়োগা পানির চেনেল তৈরী করা হয়। এই

পানির চেনেলটিকে উক্ত শহরের প্রাণ কেন্দ্র বলা হয়। কেননা এটি তৈরীর পর হতে শহরের কৃষি কাজে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং জনগণের পানির সমস্যা সমাধান হয়। চাষীগণ তাদের জীবনে সুখের মুখ দেখে।

তাহারার কৃষি উন্নয়ন ও এর কারণসমূহ

১৯৬০ সালের পূর্বে এই এলাকায় কৃষি জমিগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় খন্ড খন্ড ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো এবং ছোট আকারের জমিতে চাষাবাদ হতো। সাধারণতঃ জনগণ ধান, আলো ও অন্যান্য শষ্যাদির মিশ্র চাষে অভ্যস্ত ছিল। তখন চাষের জমি ও বসতবাড়ী গড়ে ১ হেক্টরের বেশী ছিল না। এ ছাড়া চাষের জন্য কৃষকদের সর্বদা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে লড়াই করে চলতে হতো। পানির অভাবে সেচ ও কৃষি সম্প্রসারণের কাজ ব্যাহত হতো। এমনকি খাবারের জন্য বিশুদ্ধ পানিরও অভাব ছিল্ ১৯৬০ সালের প্রারম্ভে কৃষি কাজে বিশেষজ্ঞতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। তয়োগা পানির চেনেল নিমার্ণ হেতু কৃষি উন্নয়নে দ্রুত ও বিশেষ উন্নয়ন আসতে থাকে। এভাবে তাহারা শহরের উন্নয়নের মূল শিকড় এই পানির চেনেলটি বিভিন্ন কার্য সম্পাদনে সাহায্য করতে লাগল। বর্তমানে সেচ কাজের জন্য ব্যবহৃত ঘরের কাজ সম্পাদনে এবং শিল্প কারখানার কাজে এই চেনেলের পানির ব্যবহার হচ্ছে।

১৯৫৮ সালে এই চেনেল তৈরীর কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কৃষি উন্নয়নের আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে থাকে। সেগুলো হচ্ছেঃ তায়োগার পানির মাধ্যমে শহরের গ্রীন হাউজগুলোর বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হতে থাকে। ফলে তাহারায় প্রচুর কারনেশন ফুল, তাজা ফলমূল বিশেষ করে তরমুজ, টমেটো অনবরত উৎপাদিত হতে থাকে। তাহারা শহরে টমেটো উৎপাদনের জন্য নতুন কৌশলাদি ব্যবহৃত হতে থাকে যেমন হাইড্রোফনিক পনহার মাধ্যমে টমেটো উৎপাদন। শুধু পানি দিয়ে কম্পিউটারের সাহায্য একই সাইজের হাজার হাজার টমেটো এখানে সারা বছর উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে টমেটো তাহারা শহর এবং জাপানের বিভিন্ন শহরে বিক্রি হচ্ছে। এভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই শহর প্রচুর লাভবান হচ্ছে। এই ভাবে শহরে চাষ উপযোগী জমিগুলো গ্রীন হাউজগুলোতে রূপান্তরিত হতে থাকে।

তাহারা শহরের কৃষি উন্নয়নের আরেকটি দিকে হচ্ছেঃ উন্নতমানের আধুনিক কৃষি যন্ত্রাদি ব্যবহার এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রাদি ব্যবহারে বিশেষজ্ঞতা এবং সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান। কৃষি উন্নয়নের সাথে সরকারের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ওতপ্রেতভাবে জড়িত। সরকারের এগ্রিকালচারাল ষ্ট্রাকচার ইমপ্রোভমেন্ট প্রোগ্রাম

(এএস আইপি ১,২,৩) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নহেতু এই শহরে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিতে পেরেছে। এসএস আইপি-এর নীতির উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছেঃ তাহারা শহরের জমিগুলো কৃষি উৎপাদনের উপযোগী করার জন্য জমি সম্প্রসারণ এবং নিবিড় চাষে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। কৃষকদের কৃষি কাজে বিশেষজ্ঞ করে তোলা এবং তাদের আদর্শ চাষী হিসেবে গড়ে তোলা। পূর্বের খন্ড খন্ড বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চাষের উপযোগী জমিগুলোকে একত্রিভূত করে কৃষকদের দলগত চাষের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ। দলগত চাষের জন্য উপযুক্ত সেচ প্রকল্প অবকাঠামো তৈরী।

সরকারের এই নীতি গ্রহণের ফলে পূর্বের খন্ড খন্ড জমিগুলোকে একত্রিত করে কৃষি উপযোগী করা হয়। কৃষকদের আর্দশ কৃষক হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে এবং তারা কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সেচপ্রকল্প তৈরী হেতু কৃষিকাজ ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। কৃষি কাজে সরকারের ভতূর্কী দান এবং দলগত চাষের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। সরকারের এ প্রচেষ্টার সাথে সাথে স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক সংগঠন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ভূমি দখল এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নির্ধারণেও তাহারার স্থানীয় সরকারের বিশষ দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। এছাড়া, বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, সঠিক মূল্য নির্ধারণ ও সঠিক বাজারজাতকরণ ইত্যাদি এই শহরের কৃষি কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের বিশেষ চাবিকাঠি। এই প্রচেষ্টা কৃষকদের সামান্যতম অবস্থা হতে আজ উন্নয়নের চরম শিখায় পৌঁছে দিয়েছে। যা কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের একটি বিশেষ কারণ।

কৃষি সমবায় সমিতি সংগঠন

অতীতে শহরটির পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে এই এলাকার অধিবাসীগণ শহরের উন্নয়ন সম্পর্কে সব সময় সচেতন ও সজাগ। সব ধরনের পরিবর্তন মোকাবিকার জন্য এই শহরে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সংগঠনসমূহকে গড়ে তোলা হয়েছে। এ ধরনের দলসমূহের মধ্যে তাহারার কৃষি সমবায় সমিতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ সমবায় সমিতির সংগঠন পদ্ধতি ও কর্মদক্ষতার নিপুণতা প্রশংসনীয়। এটি এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতি, যেখানে প্রতিটি সদস্য কৃষকদের জন্য সামাজিক ও সম্প্রসারিত সেবাদান করে থাকে। এই সব সেবার মধ্যে চাষের জন্য প্রযুক্তি, অর্থ এবং ইনসিওরেন্সও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই কৃষি সমবায় সমিতির মহিলাদের জন্য একটি সমবায় সমিতি ডিভিশন গঠন করেছে। মহিলা সদস্যগণ স্বতঃস্ফূত ও সক্রিয়ভাবে পুরুষের ন্যায় সমপর্যায়ে সেবাদানে নিয়োজিত রয়েছেন। মহিলা সদস্যদের প্রতি সমিতি

প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ হলোঃ কৃষক পরিবারদের মধ্যে সুস্থ জীবন যাপনের পদ্ধতি ও তা গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা এবং এই উদ্দেশ্য মহিলা সদস্যগণ কৃষক পরিবারগুলোকে নিয়মিত পরিদর্শন এবং তাদের স্বাস্থ্য কিভাবে সুস্থ, সুখের ও সুন্দর রাখতে পারা যায় তার উপর নিয়মিত বক্তৃতা এবং উপদেশ দান করে থাকে। এভাবে কৃষকদের স্বাস্থ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য তারা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা তাহারাবাসীদের জীবনের মান উন্নয়নের যথেষ্ট সাহায্য করছে।

কৃষকদের জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনার জন্য কৃষি সমবায় সমিতি তাহারা শহরে একটি সুপার মার্কেট তৈরী করেছে। এই সুপার মার্কেট তৈরীর উদ্দেশ্য শুধু মাত্রা লভ্যাংশ নেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরঞ্চ সমবায় সমিতির সদস্যগণ যাতে করে অল্প পয়সার বা সস্তায় জিনিসপত্র ও খাদ্য সামগ্রী কিনতে পারে তার সুযোগ করে দেয়া। কৃষকদের জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনাই এই সুপার মার্কেট নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য। মহিলা সমবায় সমিতির ডিভিশনের ন্যায় এই কৃষি সমবায় সমিতিতে কৃষি নিয়োজিত যুবকদের জন্য আর একটি শাখা রাখা হয়েছে এই সমিতিটি একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠান এবং এটি প্রশংসনীয় ভাবে সক্রিয়। এই সমিতিতে ১৯৮৮ সাল হতে ২৩ জন কৃষি যুবক উত্তরাধিকার সূত্রে স্থানীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছেও রেজিষ্ট্রার্ড হয়েছে। এই যুবক সমিতির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছেঃ কৃষি যুবক উন্নয়ন কাজে কৃষকদের দক্ষতাকে আরও দক্ষ ও বলিষ্ঠ করে গড়ে তোলা; কৃষকদের জীবনকে আরও সামাজিক ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলো; প্রজন্মদের এই পেশার প্রতি আরও বেশী উদ্বুদ্ধ করা যাতে এই পেশায় তারা সর্বদা নিয়োজিত থাকতে আগ্রহশীল হয়।

তাহারার কৃষি উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমানে কৃষি উন্নয়নে চরম শিখায় পৌছার পরও তাহারা শহরের স্থানীয় সরকার ও জনগণ সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা করছেন। যথাঃ কৃষি সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয়কে ভবিষ্যতে কিভাবে তারা মোকাবিলা করবে এবং কিভাবে তা নির্ধারণ করবে। এই সব চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

*আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়সমূহ জাপানের উপর তার আভ্যন্তরীণ বাজার, রপ্তানী ব্যবসা খুলে দেওয়ার জন্য যে প্রভাব সৃষ্টি করছে, এর জন্য তাহারা শহরের ভবিষ্যতের কৃষি কৌশল কিরূপ হবে?

*কৃষি উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পেলে ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে কি ধরনের কৌশলাদি গ্রহণ করা উচিত?

*কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ যৌক্তিকতা কিরূপ হবে ?

*তাহারায় উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যাদির সাথে জাপানের অন্যান্য শহরের উৎপাদিত দ্রব্যাদির মান নির্ণয়ের জন্য কিরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন ?

*কৃষির জন্য নিত্য নতুন ও উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রাদি ব্যবহার বিশেষ করে বায়োটেকনলজি প্রক্রিয়ার প্রচলন কিভাবে করা যায়?

*ঐতিহ্যবাহী কাজকে প্রবাহমান রাখার নিশ্চয়তার জন্য বৃদ্ধ কৃষক হতে যুবক কৃষকের কাছে কৃষি কাজ হস্তান্তরকরণ এবং এই যুবক কৃষকদের কৃষি কাজ ব্যতীতে অন্য কোন কাজে যোগদানে বিরত রাখার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ইত্যাদি।

এই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য দুর্বল হচ্ছে তাহারার যুবকগণের কৃষি কাজে যোগদানে অনীহা। কৃষি কাজে মোট আকারের আয়, জীবনের মান অনেক উন্নতমানের হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার যুবক সম্প্রাদয়ের কাছে এ কাজটি বিশেষ আকর্ষণীয় বা জনপ্রিয় নয়। এ পেশাকে তারা সারা জীবনের পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। এ ব্যাপারে আলোচনায়, জানা যায় যে, বিয়ের বেলায় এই পেশায় নিয়োজিত বর্তমান কৃষক যুবকদের বেশ সমস্যা হচ্ছে। কেননা তাহারা শহরের যুবতী মেয়েরা যুবক কৃষকদের সাথে বিবাহ বন্ধনে এতটুকু আগ্রহী নয়। এর কারণ সংসারে কৃষকদের স্ত্রীদের অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। কৃষকদের স্ত্রীদের সারা দিন ঘরের ও কৃষি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। এ জন্য যুবতী মেয়েরা এ ধরনের জীবনের প্রতি আগ্রহী নয়। সরকার বর্তমানে ২৩ জন যুবক কৃষককে, বৃদ্ধ কষকদের পরিবর্তে উত্তরাধীকারী চাষী হিসেবে পদবী দান করেছে। এরা বর্তমানে কৃষকদের ভবিষ্যৎ বংশধর হিসেবে কৃষি কাজে প্রতিনিধিত্ব করবে।

বর্তমানে তাহারা শহরের স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাবন্দ ও জনগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, তারা কৃষি কাজ প্রতিযোগিতায় এবং উন্নয়নে আধুনিক ও উন্নতমানের কলাকৌশল ব্যবহার করে মূল্য সংযোজন (ভ্যালুএডেড) চাষ করতে সক্ষম হবে। ভ্যালুএডেড এর পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা শহরে একটি উপদেশনা দল সংগঠিত হয়েছে। এই উপদেশনা দল শহরের কৃষি কমিটির সদস্য মহিলা কৃষক ও যুবক কৃষকদেরও

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কৃষি কাজে যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে সম্মিলিতভাবে এর সমাধান করতে হবে। অবশ্য এ ধরনের সমস্যা সমাধানে তারা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের সহায়তা ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এতদ্ব্যতীত পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়নের প্রেক্ষিতে এবং কৃষকদের বাড়ি ঘর ঝকঝকে, তকতকে ও সুন্দর রাখার জন্য জনগণ অহরহ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমানে কৃষকদের বাড়ীতে সুষ্ঠূ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর সুবিধা শতকরা ৩০% পরিবার পাচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শহরের জীবনের মত কৃষকদের জীবনের মান উন্নয়ন, যাতে করে যুবক ও কৃষকগণ যেন শহরে জীবনে উৎসাহিত না হয়। বর্তমানে তাহারা শহর প্রশাসন কৃষকদের দুর্দিনে ছুটি দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে যাতে করে কৃষকগণ আনন্দের সাথে তাদের ছুটিগুলো উপভোগ করতে পারে। এভাবে তাহারার মধ্যে কৃষকদের সুন্দর জীবন যাপনের মানসিকতার গড়ে উঠেছে।

কৃষি উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ক) ভবিষ্যতে উন্নতমান কৃষি কাজ বৃদ্ধির জন্য টেকনিক্যাল কলাকৌশল বৃদ্ধি;

খ) কৃষি কাজকে আকর্ষণীয় করার নিমিত্তে কৃষি কাজের উপর বিভিন্ন তথ্য বিনিময়;

গ) কৃষির উপর প্রশিক্ষণ দান;

ঘ) সমাজ ও গ্রামসমূহ কর্তৃক উন্নয়নের প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত রাখা।

তাহারার শিল্প উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

তাহারা শহরের শিল্প উন্নয়নের দিকও খুব উল্লেখযোগ্য। শিল্প উন্নয়নের একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে, শহর ও গ্রামের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ বিদ্যমান (আরবান রুরাল লিনকেজ)। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এখানকার শিল্পউন্নয়ন কৃষি উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। এই দুখাতের (বা সেক্টরের) উন্নয়ন এবং সেবামূলক শিল্প (টারসিয়ারি) উন্নয়নের কৃতকার্যতা প্রসংশিত। এই কৃষি এবং শিল্প খাতে যোগাযোগের ধরনকে যে কোন উন্নয়শীল দেশ অনুকরণ করতে পারে।

১৯৫০ সাল হতে সরকারের প্রচেষ্টার ফলে এই শহরে সুস্থ অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এখান উল্লেখ্য যে, সরকারের প্রকল্পসমূহ, যথাঃ (১) তয়োগা পানির চেনেল, (২) ভূমি সংগঠন ও ভূমি পুনঃ দখল ইত্যাদি এই শহরের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এই ধরণের উন্নয়নের অভিজ্ঞতার সাথে সাথে

স্থানীয় জনগণের মধ্যে সমন্বয়, দক্ষতা, সহমর্মিতার ভাব, সহযোগিতার নিপুণতা, একে অন্যের উপর অগাধ বিশ্বাস ইত্যাদি বিশেষ কৃতিত্ব বহন করে। ১৯৬০ সালের পূর্বে তাহারা শহরের শিল্প কারখানাগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছিলো। উল্লিখিত কারখানাসমূহ সিমেন্ট, বাড়ীর ছাদ নির্মাণের জন্য টাইলস তৈরী, সামদ্রিক খাদ্য বস্তু (সি ফুড) তৈরী ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের মেশিনাদি তৈরীর কাজে নিয়োজিত ছিল। এ ধরনের শিল্পকারখানাগুলো স্থাপনে তেমন কোন পরিকল্পনা ছিল না। তাই সেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। মাত্র ১৮% লোক এসব শিল্প উন্নয়নের সুবর্ণ পরিবেশ ছিল। এ সময় কৃষি বিভাগ বেশ শক্তিশালী খাত হিসেবে গড়ে উঠে। তাহারার গ্রাম এলাকায় ছোট আকারের শিল্প কারখানাগুলো টোকায়ডো সমদ্র এলাকা জুড়ে উন্নতি করতে লাগল। ১৯৬৮ সালে তয়োগা পানির চেনেল নির্মাণ শেষে এলাকায় কৃষি কাজ উন্নয়নের সাথে সাথে শিল্প উন্নয়ন দ্রুত ভাবে এগিয়ে যেতে থাকে।

১৯৭৫ সালে শিল্প কারখানার উন্নয়নের জন্য জমি পুনঃ উদ্ধার কাজ সম্পন্ন হয়। এবং এর সাথে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃক বন্দরের সুযোগ গ্রহণ করা হয়। এই বন্দরটির নাম মিকওয়া বন্দর। বন্দরটি সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের সাথে সাথে একটি বৃহৎ সিমেন্ট কারখানা পুনঃ উদ্ধারকৃত জমিতে (১৯৬৯) গড়ে উঠে। ফলতঃ দেখা যায়, এর পরবর্তি বৎসরগুলোতে ৩০টির অধিক শিল্প কারখানা এই সামদ্রিক শিল্প এলাকা জুড়ে স্থাপিত ও সম্প্রসারিত হতে থাকে। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ ধরনের শিল্প সম্প্রসারণের ফলে ১৯৭৯ সালে টয়োটা মটরস করপোরেশন এখানে একটি অটোমোবাইল এসেমবল প্লান্ট স্থাপন করে। এই প্লান্টটি সর্বমোট ২০০ হেক্টের জুড়ে বিস্তৃত অর্থাৎ উল্লিখিত শিল্প এলাকার ৩০% জমিতে এই প্লান্টিটি বিস্তৃত। এতে সর্বমোট ৫০০০ হাজার লোক নিয়োজিত। এই প্লানটি ২০% থেকে ৬০% স্থানীয় কর বৃদ্ধি করেছে।

উল্লিখিত শিল্প কারখানার উন্নয়নের সাথে সাথে তাহারা শহরের জনগণের জীবনের মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে সাথে তাহারার জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ও সেবার চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং পরবর্তিতে তাহারা শহরে দুটি বৃহৎ আকারের সুপার মার্কেট এবং ৬০০ শত খুচরা দোকান স্থাপিত হয়। এ সব দোকান ও সুপার মার্কেট হতে বাৎসরিক গড়ে ৬০ বিলিয়ন ইয়েনের জিনিষপত্র বিক্রি হয়ে থাকে।

বর্তমানে এই ধরনের শিল্প উন্নয়নের সাথে তাহারা শহর প্রশাসন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জের এর সঠিক মোকাবেলা

কিভাবে করবে তার উপর চিন্তা ভাবনা চলেছে। যেমনঃ (১) যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের গাড়ীর চাহিদা বৃদ্ধিকরণ। (২) বর্তমানে জাপানের শ্রম মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে টয়োটা মটর করপোরেশন কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া শহরেই একটি টয়োটা গাড়ীর নতুন এসেম্বল প্ল্যান্ট তৈরী করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। কিন্তু এতে তাহারা শহরের স্থাপিত শিল্প কারখানাগুলো সম্পদভিত্তিক নয়। তাই আগামী বৎসরগুলোতে দেশীয় ভিত্তিক স্থাপন করা অতীব প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ ধরনের শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি শিল্প সেন্টারগুলোর মধ্যে দৃঢ় যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে।

তাহারার জনজীবন প্রণালী ও সামাজিক উন্নয়ন

১৯৬০ সাল হতে এ শহরে কৃষি ও শিল্প খাত পরিবর্তন ও উন্নয়নের চরম শিখায় পৌঁছেছে। তাহারা সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে। অধিবাসীদের জীবন প্রণালীর ধরন ও নেতৃত্বে অনেক পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়েছে। এ পরিবর্তন বর্তমানে তাহারার অধিবাসীদের খাদ্য গ্রহণের ধরন, বাড়ী ঘর নির্মাণ এবং সরকারের কাছে সেবার চাহিদা হতে পরিলক্ষিত হয়। এলাকায় অধিবাসীদের এখন বিরাট চাহিদা হচ্ছে সরকার কর্তৃক নাগরিকদের প্রতি সুষ্ঠ সেবা প্রদান। জীবনের মান উন্নয়নের সাথে সাথে বর্তমান তাহারার ঘরে ঘরে অধিক পরিমাণের আর্বর্জনা জমেছে এবং সেগুলো দুরীরণর সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে তাহারায় একটি রিসাইক্লিং কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এই রিসাইক্লিং কেন্দ্রের মাধ্যমে ঘরের আর্বজনাসমূহঃ

*অরর্সেনিক সার উৎপাদন করছে যা, শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

*আবর্জনাগুলোকে জমি ভরাট করার কাজে লাগানো হচ্ছে, তবে মেটাল ও কাচঁসমূহ শিল্প কারখানার কাজে পুনঃ ব্যবহারের জন্য আলাদা করে রাখা হচ্ছে।

*পয়ঃ প্রণালী কেন্দ্র নির্মাণ হেতু প্রত্যেক বাড়ীতে সুষ্ঠু সুয়েরেজ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে অধিবাসীদের জন্য এলাকায় একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। যার ফলে তাহারাবাসী মনে করে তারা খুব খুশি সুখী। এরূপ পরিষ্কার সুখময় ও সুস্থ জীবন যাপনের জন্য অধিবাসীগণ খুব সচেতন। তারা উল্লেখিত ব্যবস্থাপনা নিয়মিত

লক্ষ্য রাখে। এভাবে তাহারার অধিবাসীদের জীবনের ও সমাজের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে তাহারার জনগণের মধ্যে মূল্যবোধ, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে। অবশ্য এই পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বে তাহারা শহরে বর্তমানে বেশ কতকগুলো সমস্যা রয়েছে। এ শহরের যুবক ও যুবতীরা গ্রামে বাস করতে অনীহা প্রকাশ করছে। দিন দিন শহরের প্রতি তাদের আর্কষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষি কাজে তাদের আকর্ষণ হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে এটি তাহারা শহরের কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট একটি হুমকীস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মনোভাব অধিকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে তাহারার যুবতী মেয়েদের মধ্যে। এসব মেয়েদের মতে কৃষি কাজ বড় কঠিন, ঐতিহ্যবাহীও পুরোনো পেশা। এটি তাদের অপছন্দীয় কাজ। শহরের বেতন ভোগী কাজ তাদের অনেক ভাল লাগে। কৃষি কাজে বেতন বেশি দিলেও তারা একাজ করতে আগ্রহী নয়। একারণে তাহারার অত্যধুনিক কৃষি ও শিল্প কাজে অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বে এখানকার যুবক ও যুবতী সম্প্রদায়কে একাজে ধরে রাখার প্রচেষ্টা তাহারার সমাজে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাহারা শহরের পরিকল্পনা পদ্ধতি

সরকার এই শহরের জন্য সামগ্রিকভাবে তৃতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় শহরের ভৌত কাঠামো গড়া এবং সব রকম মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনার একটির বিশেষ উদ্দেশ্যে হচ্ছে শহরটিকে সূর্যের আলোয় ঝলমল একটি সুন্দর সবুজ শহর হিসেবে গড়ে তোলা। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ভূমির উপর সঠিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা বিশেষ করে শিল্প উন্নয়ন এবং এর সম্প্রসারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জমির ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাই শিল্প উন্নয়নের জন্য উপ সাগরের উপকূল এলাকার ভূমিগুলির পুনঃ দখলের প্রচেষ্টা চলেছে।

দ্বিতীয়তঃ তাহারা শহরকে ভ্রমণ কেন্দ্র সিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা। এ জন্য স্থানীয় সরকার (মিউনিসিটিপ্যালটি) আইচি প্রিফেকচারের এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ব্যারোতে (যারা ভূমি দখল নিয়ে জড়িত) প্রতিনিধিত্ব করছে যাতে করে ভষ্যিতে দখল জমিগুলোকে শিল্পকারখানা এবং অনন্দদায়ক কাজের জন্য ব্যবহার করা যায়। শহরটিকে আকর্ষণীয় করার এবং তার শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য

খাতের উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রাখা উল্লিখিত পরিকল্পনা একটি বিশেষ দিক। পরিকল্পনার অংগসমূহ হচ্ছেঃ

(ক) মৌলিক ধারণা (বেসিক কনসেপ্ট)। এটি তাহারা শহরে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অর্থাৎ ২১তম শতাব্দী যথা ২০১০ হতে ২০১৫ সালকে বোঝাচ্ছে।

(খ) কাঠামোগত পরিকল্পনা (ষ্ট্রকচারাল প্ল্যান)। কাঠামোগত পরিকল্পনা ১৯৮৬ হতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বোঝাচ্ছে।

(গ) বাস্তবায়ন কর্মসূচী এটি তিন বৎসর পর্যন্ত চলমান পরিকল্পনার অন্ত র্ভুক্ত।

(ঘ) বাৎসরিক বাজেট। প্রজেক্ট অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন কর্মসূচী প্রণয়ণের জন্য।

সুসম উন্নয়ন কৌশল

উন্নয়নের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের, তাহারা শহরের উন্নয়নের বিষয়ে একটি সুষ্ঠ ও সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। এই শহরের উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাস্তবায়ন ক্ষমতা ও ভবিষ্যত উন্নয়নের মধ্যে দূরদৃষ্টি অতীব প্রশংসনীয়। এই পরিকল্পনার মূখ্য কৌশল হচ্ছে শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অর্থাৎ এ দুটির সম্মিলিত সুসম উন্নয়ন। তাহারাবাসী ও কর্মকর্তাগণ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক এবং বিস্তৃতি সম্পর্কে খুবই সচেতন। শিল্পের উপর নির্ভরশীলতা দূরীকরণেও তারা বিশেষ ভাবে সজাগ। এ ধরণের কাজের উদাহরণ টয়েটা মটর করর্পোরেশন স্থাপন হতে বোঝা যায়। এটি এমন একটি স্বয়ংস্পূর্ণ শিল্প কারখানা, যার যথেষ্ট বিস্তৃতি রয়েছে এবং শিল্পকারখানার নির্ভরশীলতা বলতে এখন আর নাই বললেই চলে।

বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য দিক

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্রতম ও অনুন্নত দেশ, যার মাথা পিছু আয় ছিল সে সময় মাত্র ২২০ ডলার। এদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। সেহেতু দরিদ্রতা এদেশের উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। সে কারণে বাংলাদেশে জাতীয় সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার এর প্রতিষ্ঠানগুলো দারিদ্র বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এছাড়া আমাদের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯০-৯৫ এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। স্থানীয় সরকারের সাথে সাথে ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান সংস্থাগুলো কৃষি, মৎস্য চাষ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য এসব দারিদ্র বিমোচনের কাজে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি হচ্ছে উন্নত থানা প্রশাসন। কেননা, এদেশের উন্নয়নের জন্য থানাগুলোর উন্নয়ন বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন। জাতীয় উন্নয়নের জন্য থানা প্রশাসনের গুরুত্বও অপরিসীম। থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সর্বদা থানা প্রশাসনের সমন্ববিধায়ক হিসাবে কাজ করতে হয়। প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সুচারুরূপে, নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার দায়িত্ব থানা নির্বাহী কর্মকর্তার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। আমাদের দেশে থানা ও জেলা পর্যায়ে বিবিধ কর্মকান্ডের মধ্যে এখনও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রশাসনিক জটিলতা রয়েছে। থানার সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমঝোতা ও সহযোগিতার উপর। স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করতে গেলে কয়েক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে হয়। যেমনঃ

(১) সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে জন প্রতিনিধিদের সম্পর্ক;
(২) সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের সম্পর্ক;
(৩) সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে জনগণের (বিশেষ করে beneficiary) সম্পর্ক;
(৪) সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে বেসরকারী কর্মকর্তাদের সম্পর্ক।

উল্লেখিত চার ধরনের সম্পর্কের মধ্যে অনেক রকম সমস্যা রয়েছে, যা অনেক সময় সুষ্ঠু ভাবে সমাধান হয়ে উঠেনা। এ জন্য প্রয়োজন স্থানীয় পর্যায়ে একতা, সমঝোতা ও দক্ষ সমন্বয়। এছাড়া আমাদের দেশে রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রশাসনে, সমাজে ও জনগণের মনেও অনেক পরিবর্তন আসে। স্বাধীনতার এতদিন পরও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থাতে যথেষ্ট দুর্বলতা দেখা যায়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, আমাদের দেশে এ পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে শক্তিশালী কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে পদ্ধতিগুলি সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়, যার জন্য সর্বদা অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। একই ভাবে সমাজ ও তার অর্থনৈতিক দৈন্যতা হেতু জনগণের মধ্যেও সর্বদা হতাশা দেখা যায়।

রাজনৈতিক ধারার জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে গতিশীলতা বাধা পায়। অনেক সময় জনগণের প্রয়োজন এর চাইতে রাজনীতিবিদদের স্বার্থের খাতিরে উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সরকারের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক

সহযোগিতার দৃষ্টান্ত ও বিরল। এছাড়া স্থানীয় সংস্থা সংক্রান্ত যে সব বিধি বর্তমানে রয়েছে, তার মধ্যে একই স্তরের পারস্পরিক সহমর্মিতার কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই। এর কারণ বৃটিশ আমলে যে বিধি তৈরি হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন এখনও আসেনি। সেজন্য সরকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা কম দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় সরকারের তিনটি স্তরে (জেলা, থানা, ইউনিয়ন) আইন কানুনগুলো একই রকম নয়। এগুলোর মধ্যে যথেষ্ট অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। এজন্য কাজ করতে গিয়ে প্রশাসন বার বার ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। এ ছাড়া যে ভাবে প্রত্যেকটি জেলা, থানা এবং ইউনিয়নের জনসংখ্যার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক সেই হারে অধিক কর্মকর্তা নিয়োগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি ইউনিটের সাথে অন্যান্য সুবিধাদি তেমন বৃদ্ধি পায়নি। দক্ষ সমন্বয় ও সহমর্মিতাও বৃদ্ধি পায়নি। স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সদব্যবহারে ত্রুটি, পরিকল্পনার চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন বাস্তবায়ন সমস্যা, সুষ্ঠু কর্তব্যপালন ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব সমাজ সেবকদের অনীহা, জাতীয় প্রতিনিধিদের দুর্বলতা উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে জাপানের তাহারা শহর উন্নয়নে সমন্বয় ও সহমর্মিতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাহারার স্থানীয় সরকার উন্নয়নের জন্য জাপানে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ততা, সমঝোতা, সহযোগিতা ও এর সাথে সাথে থানা প্রশাসনের সর্ব পর্যায়ের আন্তরিকতা, যোগাযোগ কৌশল সত্যি প্রশংসনীয় ও লক্ষণীয়। তাহারার সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে দক্ষ সমন্বয় ও সমঝোতা ক্ষমতা অত্যন্ত দৃঢ় ও প্রখর যা ঐ দেশের জন্য বয়ে এনেছে সমৃদ্ধি। তাহারার স্থানীয় প্রশাসনের এই দক্ষ সমন্বয় কৌশল ও সৌহার্দতা গড়ে তুলেছে তাদের জাতীয় জীবনের সাফল্য। অনুন্নত দেশগুলোর জন্য তাহারার এই স্থানীয় সরকার একটি অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় মডেল হতে পারে।

তাহারা শহরের উন্নয়নে লক্ষণীয় পর্যবেক্ষণ সমূহ

কেন্দ্রীয় সরকার ও তাহারার স্থানীয় সরকারের উন্নয়নে সর্বক্ষেত্রে সমঝোতা, সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা বিরাজমান। এই সহযোগিতা ও সুষ্ঠু যোগাযোগের প্রভাব শহরটির প্রতিটি কর্মকান্ডে পরিলক্ষিত হয়েছে। যা শহরটি উন্নয়নের চরম শিখায় পৌঁছে দিয়েছে। অনানুষ্ঠানিক অথচ কার্যকরী 'সোদাই'দের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রভাব ও অসাধারণ যোগাযোগ ক্ষমতা জনগণ ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতার একটি দৃঢ় সেতু বন্ধন গড়ে তুলেছে। উক্ত যোগাযোগ কৌশলের

মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাহারার স্থানীয় সরকারের।

প্রথমতঃ সুষ্ঠু নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সহযোগিতা। দ্বিতীয়তঃ ভৌত কাঠামো তৈরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ, কৃষকদের একেবারে নিঃস্ব অবস্থা হতে জাপানের উচ্চমানের কৃষক হিসেবে গড়ে তোলার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ জাপানের কেন্দ্রীয় সরকারের। তয়োগা পানির চ্যানেল নির্মাণ ও সমুদ্র এলাকার ভূমি পুনর্দখলি পরিকল্পনা সত্যিই সরকারের দূরদর্শিতার উদাহরণস্বরূপ। পরিকল্পনায় দূরদৃষ্টি, কৃষি খাতে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাহারা শহরের ভূমি ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে এ ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ভাবে এ শহরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এই শহরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং সব ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় এ ধরনের কৌশলাদি সত্যিকার অর্থে অনুকরণীয়।

উপসংহারে বলা যায়, শহরটির উন্নয়নে এই শহরের প্রশাসন কৌশল, বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতা নিরসন পদ্ধতি, দ্বন্দ্ব নিরসন পদ্ধতি ও বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমন্বয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠার ধরন, স্বয়ংম্পূর্ণতা অর্জনে জনগণের অধ্যাবসায়, উন্নয়নের তাদের অদম্য আগ্রহ, নিরলস প্রচেষ্টা যে কোন দেশের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহ অনুকরণ করলে যে কোন উন্নয়শীল দেশের দরিদ্রতা দূর হতে পারে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়শীল দেশ। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জটিলতা উত্তরণের জন্য উল্লিখিত মডেলটির অনুসরণ করা যেতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

সাব্বীর, চিমা(১৯৮৮) ইনষ্টিটিউশন্যাল ডাইমেনসন অব লোকাল এন্ড রিজিওন্যাল ডেভেলপমেন্ট।

ডেভাস, নিক (১৯৮৮) সিসটেম অব এলেকেসন অব গভর্নমেন্ট ফান্ড টু লোকাল এন্ড রিজিওন্যাল গভর্ণমেন্ট। ইউএন আরসিডি।

ফিল্ড ভিজিট পেপারস। ইউএনআরসিডি, ১৯৮৮।

পেপারস অব তাহারা টাউন অফিস, তাহারা, ১৯৮৮।

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
পঞ্চদশ সংখ্যা,
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের উপর একটি সমীক্ষা

সেলিনা আখতার*

A Study on the Leather Industry of Bangladesh. Shelina Akter

Abstract: Leather is making noteworthy contribution to the national development of Bangladesh. It is a very important sector in achieving economic growth. In earning foreign currency it runs hand in hand with jute, tea, forzen and readymade garments. Leather stands immediately after jute and readymade garments in our export business. This study explores the market of raw leather, production of leather and export profit of leather and leather commodities in Bangladesh. It is found that a big market of annual average production amounting to 1.5 crore pieces of leather prevails. Tremendous potentialities of leather industry exist in export business which may lead, if aptly dealt with, to a huge foreign currency earning of taka four to five thousand crore instead of the present foreign currency earning of taka one thousand crore in this sector. A precondition has to be meted out, however; i.e. its problems have to be solved. This venture delves into the problematic and endeavours to set action agenda for the same.

যে ক'টি অতি পুরাতন অর্থনৈতিক সম্পদ আজও বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে চামড়া তাদের অন্যতম। জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে চামড়া শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ খাত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পাট, চা, হিমায়িত খাদ্য ও তৈরী পোশাকের পাশাপাশি চামড়া শিল্পের অবস্থান। বাংলাদেশের পণ্য সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে পাট ও তৈরী পোশাকের পরই এই চামড়া শিল্প। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে এক্ষেত্রে রপ্তানির মাত্রা ধার্য করা হয় ২০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে তা ছিল ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । প্রকৃত আয় অর্জিত হয় মাত্র ২১১.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশ চামড়া থেকে ৪১০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে (হোসেন, ১৯৮৭:৫৫)। ১৯৮৮-৮৯ সালে অর্জিত হয় ৪৩৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা যা দেশের মোট রপ্তানির ১২% । বর্তমানে চামড়া শিল্প হতে প্রতি বছরে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় এবং এখাতে বর্তমানে যে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করা গেলে বছরে প্রায় চার হতে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে (কামাল, ১৯৯৯)।

অমিত সম্ভাবনার এ খাতে আয় আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। ব্যাংক ঋণের সংকট, কারখানা প্রতিষ্ঠায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সুষ্ঠু জাতীয় নীতিমালার অভাবে এ শিল্প আজ চরম সংকটে নিমজ্জিত। অথচ সম্পূর্ণ দেশীয় কাঁচামাল

*সহকারী অধ্যাপক,ব্যবস্থাপনা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

নির্ভর এ চামড়া শিল্পের শুধুই এগিয়ে যাওয়ার কথা। বিদেশে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। জাতীয় উন্নয়নে এই শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অবহেলা ও নিয়মনীতির অভাবে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হচ্ছেনা। অথচ বাংলাদেশে এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহের নিশ্চয়তা রয়েছে। অন্য অনেক শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানীতে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় চামড়ার ক্ষেত্রে তা হয় না। ট্যানারি শিল্প আধুনিকায়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা দানের দীর্ঘসূত্রিতা মূলতঃ বহু ট্যানারির জন্য ক্ষতি বয়ে এনেছে। চামড়া শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও বিভাগসহ সভা, সেমিনারে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ কোন ফল হয়নি। এ রকম অনেক সমস্যা নিয়েই চামড়া শিল্পের পথ চলা।

১৯৯০ সালে ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও মান্ধাতার আমলের চামড়া কারখানাগুলি আধুনিকায়ন ও উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহের নিমিত্তে সরকারি কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। ফলে চামড়া শিল্প বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছে হাজার হাজার শ্রমিক। পাকা চামড়া রপ্তানির পরিমাণ গত কয়েক বৎসর যাবৎ হ্রাস পাচ্ছে। পাকা চামড়া রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেলেও বিশ্ববাজারে দ্রুত বর্ধনশীল চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে চামড়াজাত দ্রব্য, বিশেষ করে চামড়ার ব্যাগ ও জুতা রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে। আমাদের চামড়াজাত পণ্যের মান খুব উন্নত। বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন চামড়ার ব্যাগ ও জুতা রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের চামড়া শিল্পকে গড়ে তোলা সম্ভব।

বর্তমান প্রবন্ধে চামড়া শিল্পের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত গতিধারা অনুধাবনের প্রচেষ্টা রয়েছে। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছেঃ ১) বাংলাদেশে কাঁচা চামড়ার বাজার নিরীক্ষণ, ২) চামড়া পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও মুনাফা সম্পর্কে জানা, এবং ৩) চামড়া শিল্পের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কর্মনীতির অন্বেষণ করা। প্রবন্ধটি নীতি নির্ধারক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও চামড়া শিল্পের উপর অনুসন্ধিৎসুদের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

এই প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য চট্টগ্রামের দুটি এবং ঢাকার চারটি ট্যানারি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ট্যানারিসমূহের বাস্তব অবস্থা নিরীক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্মকর্তা ও চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত উৎপাদক, পাইকার, বেপারী, আড়াতদারদের সাথে সংলাপের মাধ্যমেও এ শিল্পের বাস্তব অবস্থান অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। গৌণ তথ্যের ক্ষেত্রে চামড়া সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রকাশনা যেমন বার্ষিক পরিসংখ্যান গ্রন্থ, বিনিয়োগ নীতিমালা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ এবং বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান প্রভৃতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও চামড়া শিল্প সংক্রান্ত সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা কর্ম, পুস্তক পুস্তিকা, গবেষণা প্রবন্ধ হতে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে এই প্রবন্ধের তত্ত্বগত কাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে।

চামড়া শিল্পের ঐতিহাসিক পটভূমি

ইতিহাসবিদদের গবেষণায় দেখা যায় চামড়ার ব্যবহার শুরু হয়েছে প্রায় সাড়ে ৫ লাখ বছর আগে (হুসেইন ও করিম, ১৯৯৬)। প্রযুক্তি বিকাশের ফলে চামড়া শিল্পের অগ্রগতি ঘটে অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে। এ সময়ে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ, আর্মেনীয় প্রভৃতি ইউরোপিয়ান জাতি চামড়া শিল্পে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। মানব সভ্যতার প্রথমিক যুগ হতেই পাকা চামড়ার ব্যবহার চলে আসছে। অতি প্রাচীন কালে গ্রীসের সাহিত্য ও ইতিহাসে পাকা চামড়ার ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাক ঐতিহাসিক যুগে গাছের চাল বা সব্জি জাতীয় বস্তুর কষ লাগিয়ে চামড়া পাকা করার কৌশল মানুষের জানা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বে মিশরে চামড়ার পোশাকের প্রচলন ছিল। আদি যুগে বন্য পশু শিকার করে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত। মধ্যযুগে মুসলিম দেশগুলিতে পাকা চামড়ার শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং মুসলমানরাই ঐ সময়ে ইউরোপে পাকা চামড়ার প্রবর্তন করে। ঐ সময় মরক্কোর পাকা চামড়া সমগ্র ইউরোপে এর চমৎকার রং ও উৎকৃষ্ঠ মানের জন্য বিশেষ ভাবে আদৃত হত। তোমাস আরনল্ড তাঁর *লিগেসি অব ইসলাম* নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, মুসলমানদের দ্বারা প্রস্তুত কোর্দ্দবান নামক পাকা চামড়ার জন্য স্পেনের করডোবা প্রসিদ্ধ ছিল। পরে কর্দ্দোবান চামড়া দিয়ে "মুদেজার" নামক পুস্তক বাঁধাইকারী বা দপ্তরীগণ পুস্তক বাঁধার সুন্দর সুন্দর প্রণালী বের করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার কারখানা ইউরোপে বড় বড় বাণিজ্যিক শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চামড়া পাকা করার জন্য নানাবিধ বস্তু এবং কলের ব্যবহার আরম্ভ হয় (হক,১৯৮৮ :১০৪)।

মধ্যযুগে থেকে কয়েক শতাব্দী ধরে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ, আর্মেনীয় প্রভৃতি ইউরোপিয়ান জাতি পাক-ভারত বাংলা উপমহাদেশের দিকে বণিকসুলভ লোলুপ দৃষ্টি ফেলেছে। ইংরেজ বণিকরা এই মুনাফার পথ ধরে উপনিবেশ কায়েম করে রাজদন্ড হাতে নিয়েছিল। যে কটি পণ্য তাদের সওদাগরিকে প্রলুব্ধ করেছিল তার মধ্যে মশলা ও বস্ত্রের পাশাপাশি ছিল চামড়া। পরবর্তীতে যোগ হয় নীল ও পাট (বাবর, মীর ও করিম , ১৯৯৪)।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের ধাঁচে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার কারখানা প্রথম বারের মত ভারত বর্ষের কানপুরে স্থাপিত হয়। এরপর গত একশত বৎসরের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের নানাস্থানে চামড়ার কারখানা স্থাপিত হয়। তবে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরই মূলতঃ এখানে চামড়ার কারখানা গড়ে উঠতে থাকে ব্যাপকভাবে। বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালের পূর্বে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কোন কারখানা ছিল না। চর্মকার বা চামারগণ কুটির শিল্প হিসাবে চামড়া পাকা করত তবে সেই পাকা চামড়া মানের দিক থেকে খুব বেশী উন্নত ছিল না। চট্টগ্রাম হতে লবণ দেয়া শুকনা চামড়া কলকাতা, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাকা করার জন্য প্রেরিত হত।

ভারত বিভাগের পর বাংলাদেশ হতে প্রচুর পরিমাণে অর্ধপাকা চামড়া পাকিস্তানে পাঠান হত। বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিবৃত্ত বিস্তারিত জানা যায় না। তেমন ধারাবাহিক ব্যাপক রেকর্ড সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হয়ত কেউ বোধ করেনি। তবে যুক্তরাজ্যের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কাইভে সংরক্ষিত এক রিপোর্টে দেখা যায়, অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনকালে ১৯২১ সালেও হাজারীবাগে ট্যানারী ছিল। অর্থাৎ এ অঞ্চলে ট্যানারীর বয়স পৌনে এক শতাব্দীর বেশী। উল্লেখ করা প্রয়োজন লীডস চর্মশিল্প এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য পৃথিবী বিখ্যাত। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাদেশের ২/১ জন চর্ম প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ডক্টরেট নিয়েছেন। জানা গেছে এ শতকের বিশের দশকেও হাজারীবাগ থেকে কাঁচা চামড়া শুকিয়ে লীডস ও অন্যান্য বৃটিশ শহরে নেয়া হতো প্রসেসিং এর জন্য (বাবর, মীর ও করিম ১৯৯৪)। ৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেলে ভারতীয় বাটা কোম্পানীর বহু উর্দুভাষী মুসলিম কর্মচারী ভাগ্যে বিপর্যয়ের শিকার হন। তাঁরা সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার কবল থেকে বাঁচার জন্য তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন ভারত উপমহাদেশে "চর্মশিল্পের পীঠস্থান" হিসাবে পরিগণিত হতো কলকাতা ও কানপুর।

ইংরেজ শাসনের অবসান না ঘটা পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ছিল কাঁচা চামড়ার উৎকৃষ্ঠ সংগ্রহশালা। ১৯৪৭ সালের পর থেকে বাংলাদেশে চামড়া কারখানা গড়ে উঠতে থাকে রাজধানীর হাজারীরাগ, নারায়ণগঞ্জ, চট্রগ্রাম ও টাঙ্গাইলে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ঢাকার হাজারীবাগও চট্রগ্রামের কালুরঘাট এলাকাকে ওয়েট ব্লু চামড়া উৎপাদানের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করে। কালুরঘাটের চেয়ে ঢাকার হাজারীবাগকে তৎকালীন চামড়া শিল্পের মালিকেরা বেশী প্রাধান্য দেয়। ফলে হাজারীবাগে গড়ে উঠে শতাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ট্যানারি ইউনিট। বস্ততঃ পক্ষে হাজারীবাগে চামড়া শিল্পের বিপুল সমাবেশ ঘটার অন্যতম আরেকটি কারণ হচ্ছে ১৯৪৯ সালের ১০ই জুন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী কর্তৃক হাজারীবাগে ইষ্টবেঙ্গল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপন। হাজারীবাগের বর্তমান কলেজ অব লেদার টেকনোলজির ভবন, বিশালাকার ট্যানারি ভবন ও স্টাফ কোয়ার্টার স্থাপন করে সাবেক মন্ত্রী ডঃ মফিজ চৌধুরী চামড়া শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ১৯৫১ সালে টাঙ্গাইলের রণদা প্রসাদ সাহা ও আরো কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জে অস্থায়ী ভাবে ট্যানারী স্থাপন করেন। প্রথমদিকে ট্যানারিগুলোতে ম্যাকানাইজেশনের লেশমাত্র ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানি ট্যানারি শিল্পের মালিকরা এদেশে কোন ম্যাকানাইজড ইউনিট স্থাপন করেনি। বড় বড় গামলায় সাধারণতঃ কেমিক্যাল মিশ্রিত করে কেবলমাত্র দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে চামড়ার প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পন্ন হতো। একারণে চামড়ার মান হতো নীচু। অপরদিকে ভারত থেকে আগত মোহাজের কর্মচারীরা অধিকাংশই ছিল কারিগর শ্রেণীর। তাদের মধ্যে মেকানিক থাকলেও আধুনিক টেকনিশিয়ান ছিল কম। তাদের অধিকাংশই কারিগর শ্রেণীর হওয়ায় চামড়া শিল্পকে সুদূর প্রসারী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা তাদের পক্ষে নিতান্তই দূরূহ কাজ ছিল।

অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে চামড়ার সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠার কারণে চর্ম শিল্পের উপর ধীরে ধীরে সরকারি দৃষ্টি পড়তে থাকে। যার ফলে চামড়া শিল্প পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে এদেশে অন্যতম প্রধান অর্থকরী খাত হিসাবে স্বীকৃত হয়। এখানকার পাকা চামড়া পশ্চিম পাকিস্তানে বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা দেখে কতিপয় পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি তখন তড়িঘড়ি করে পশ্চিম পাকিস্তানে চালু কয়েকটি ট্যানারি বন্ধ করে দিয়ে এদেশে ট্যানারি স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তারা এখান থেকে উৎপাদিত পাকা চামড়াকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে তুলেন কতগুলো

চামড়াজাত পণ্য শিল্প। এমনি এক অবস্থায় ১৯৬০ সালের দিকে কয়েকজন পাকিস্তানি ব্যবসায়ীর উদ্যোগে ঢাকায় সর্বপ্রথম আধুনিক ট্যানারির গোড়াপত্তন হয়। বলা যেতে পারে এসময় থেকেই চামড়া উন্নীত হয় পূর্ণাঙ্গ শিল্পে।

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া ট্যানারিগুলি নিয়ে গঠিত হয় ট্যানারি পরিচালনা বোর্ড। পরে ঢাকার ২৩টি এবং চট্টগ্রামের ৭টি কারখানা নিয়ে সরকারী উদ্যোগে বাংলাদেশ ট্যানারিজ কর্পোরেশন গঠন করা হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে কিছু ট্যানারি সরকার বন্ধ করে দেন এবং বাকীগুলো পরবর্তীকালে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন এর নিকট পরিচালনার জন্য অর্পণ করা হয়। তখন ৩টি ট্যানারি পরিচালনার ভার মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু উভয়ই পরিচালনায় নিদারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়ায় ১৯৮২ সালের দিকে সবগুলো ট্যানারি ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয় এবং ১৯৮৩ সালে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট তার ট্যানারিগুলো থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়। বর্তমানে চামড়াশিল্প সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিমালিকানাধীন রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চরম গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতার কারণে সরকারী শিল্প সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের চামড়া শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চামড়ার অবস্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক মুদ্রা আনায়নকারী শিল্পখাতের মধ্যে চামড়া শিল্পের স্থান তৃতীয় (হুসেইন ও করিম, ১৯৯৬)। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ চামড়া রপ্তানি করে আয় করে ১৬৮.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। টাকার অংকে দাঁড়ায় ৬৭০.১৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে চামড়াজাত দ্রব্য থেকে বৈদেশিক মুদ্রা এসেছে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ১০০ কোটি টাকা। এ শিল্পে কাজ করছে প্রায় ১৬ হাজার শ্রমিক। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে চামড়া খাতের মোট রপ্তানি হলো ২৩৩.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (খালেক , ১৯৯৯)। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২৫০টি ট্যানারি রয়েছে। তার অধিকাংশই ১৯৫০ সালে হাজারীবাগে সরকারী ভাবে সংগৃহীত জমিতে বা তার আশে পাশে অবস্থিত। দেশের ৯০ শতাংশ ট্যানারি হাজারীবাগে, ৬ শতাংশ চট্টগ্রামের কালুরঘাট এবং বাকী ৪ শতাংশ অন্যান্য জায়গায় অবস্থিত। এই ট্যানারিগুলোর মধ্যে বছরে ৫০ লাখ বর্গফুটের বেশি চামড়া উৎপাদন করে এমন বড় ট্যানারি ১১টি, ৩০ লাখ থেকে ৫০ লাখ বর্গফুটের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মাঝারী ট্যানারি ২৬টি, বাকীগুলো ছোট ও ক্ষুদ্রাকৃতির ।

১৯৯০ সালের জুলাই মাসে ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানির উপর হঠাৎ নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে ঢাকার হাজারীবাগের ১০৮টি ট্যানারির গুদামে ১৬০ কোটি টাকা মূল্যের ওয়েট ব্লু চামড়া জমা পড়ে ছিল। ওয়েট ব্লু চামড়ার উপর হঠাৎ করে বিধি নিষেধ আরোপ করায় তা রপ্তানী করা যায়নি বলে ব্যবসায়ীদের মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানী বন্ধ করার সময় একই সাথে এমন সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছিল যে, যেসব ট্যানারিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই সেগুলোর উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং বিভিন্ন ব্যাংক থেকে এজন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। শতাধিক ট্যানারিকে এই পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে এসে সেগুলোকে আধুনিক ট্যানারিতে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়া হবে এমন ধারণা দেয়া হলেও তা কার্যকর করা হয়নি।

ট্যানারি শিল্প আধুনিকায়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক সহায়তাদানের দীর্ঘসূত্রিতায় ক্রমে শদেড়েক ট্যানারী বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এ শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ও এর উপর নির্ভরশীল ট্যানারি মালিক, শ্রমিক, কর্মচারী, রপ্তানীকারক, কাঁচা চামড়া ক্ষুদ্র ক্রেতা, আড়তদারসহ প্রায় ১ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় (কামাল, ১৯৯৯)। বিশেষজ্ঞদের ধারণা হচ্ছে, সরকারের এই ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি ছিল একটি অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ। কারণ সরকার সব ট্যানারিকে উন্নত করার ব্যবস্থা করেনি এবং এক সাথে তা করাও সম্ভব নয়। যদি এই কার্যক্রম ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে করা হত তবে এতগুলো ট্যানারি বন্ধ হয়ে যেত না সেই সাথে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী বেকার হতেন না।

সরকার ৬৯ টি ট্যানারিকে রুগ্ন শিল্প হিসাবে চিহ্নিত করার পরও এদের জন্য ব্যাংক কোন ঋণ প্রদান করেনি। ১৯৯১ সালের ১৫ জুন প্রেসিডেন্টের এক আদেশক্রমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি রুগ্ন শিল্প সেল গঠিত হবার পর সেল কর্তৃক চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত রুগ্ন শিল্পগুলোর মধ্যে চামড়া উপখাতে মোট ৬৯টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠানকে রুগ্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করে। এই ৬৯টি শিল্পকে পুনর্বাসন করা হলে রপ্তানী বাণিজ্যে অতিরিক্ত প্রায় ৪শ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। দেশে যে কটি আধুনিক ট্যানারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা খুব দীর্ঘকাল আগে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৭৭ সাল থেকে ওয়েট ব্লু চামড়ার রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছুটা ঢিলা দেয়া শুরু হয়। এ লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি ও পরিকল্পনা

কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ (টি,আই,পি) কর্তৃক চামড়ার উপর একটি জরিপ পরিচালিত হয়। এসব জরিপে বাংলাদেশের কাঁচা চামড়া উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে ক্রাস্ট/ফিনিশড হিসাবে বিদেশে রপ্তানির উজ্জ্বল সম্ভবনা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় (বাবর, মীর ও করিম, ১৯৯৪)।

ঐ জরিপের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৮৭ সালে সরকারী ভাবে দেশের চামড়া শিল্পকে ক্রাস্ট/ফিনিশড চামড়ায় রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই কর্মসূচীর আওতায় মোট ৬৫টি আধুনিক ট্যানারি গড়ে তোলা হয়। ঢাকার হাজারীবাগ ও চট্রগ্রামসহ দেশের চামড়া শিল্পখাতে সরকার পরিকল্পনাধীন বিএমআরই (Balancing, Modernisation, Rehabilitation and Expansion-BMRE) আওতাভুক্ত মোট ২৫টি ট্যানারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যারা সরকার প্রণীত নীতির আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এডিবি ও নিজ নিজ বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে বিএমআরই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ করে। ১৯৯২ সাল হতে অধিকাংশ ট্যানারি উৎপাদন /রপ্তানী কর্মকান্ড আরম্ভ করে। কিন্তু প্রকল্পের চাহিদানুযায়ী ব্যাংক প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান না করায় অপরদিকে অধিক হারে সুদ ও কিস্তি আদায় করার কারণে সরকার পরিকল্পনাধীন বিএমআরই ট্যানারিসমূহের উৎপাদন ও রপ্তানী কার্যক্রম ব্যাহত হয়। উপরন্তু রাজনৈতিক গোলযোগ, আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাজারের মন্দাভাব, উৎপাদান খরচের সাথে রপ্তানী বাণিজ্যের অসংগতি ও পরিবেশগত কারণে রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারায় গত ছয় বছরের ব্যবধানে ট্যানারীসমূহের মূলধন ঘাটতি হয়ে আর্থিক অচলাবস্থা দেখা দেয়। ফলে রপ্তানী কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার কারণে ব্যাংকের সাথে লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়ায় অনেক বিএমআরই আওতার্ভুক্ত ট্যানারির ব্যাংক হিসাব সুদে আসলে বেড়ে যাওয়ায় বিপুল অংকের দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে সরকার প্রণীত নীতি এবং পরিকল্পনার আওতায় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বর্ণিত অধিকাংশ ট্যানারীগুলোর বিএমআরই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলেও ১৯৯২ সালের পর এই ট্যানারিগুলোর খোজ খবর সরকারের কোন মহলই রাখেনি। এদিকে চামড়া শিল্প খাতে দুটি এসোসিয়েশন বিদ্যমান থাকলে সরকার পরিকল্পনাধীন বিএমআরই ট্যানারীগুলোর বিরাজমান সংকট নিয়ে এসোসিয়েশনদ্বয় বিশেষ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। আধুনিকায়িত ট্যানারিসমূহের উন্নয়ন ও উৎপাদন কর্মকান্ড ব্যাহত হলে গোটা চামড়া শিল্প খাতের উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাই হুমকীর সম্মুখীন হবে। এ

পরিপ্রেক্ষিতে, বিএমআরই ট্যানারিসমূহের বিদ্যমান ব্যবসায়িক সমস্যা নিরসনের অভিপ্রায়ে সরকার বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্তই জরুরী হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর উচিত মামলা মোকদ্দমার পথ এড়িয়ে বিএমআরই ট্যানারিগুলোর বিদ্যমান ব্যবসায়িক সমস্যা উভয়ের স্বার্থ রক্ষায় আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করা। এ ক্ষেত্রে সরকার ও ব্যাংকের বিদ্যমান নীতি নমনীয় ও পরিবর্তন হওয়া উচিত।

বাংলাদেশে কাঁচা চামড়ার বাজার

বাংলাদেশের আনাচে কানাচে প্রতিদিন প্রচুর গবাদি পশু জবাই হয়। পশু দু'প্রকার বন্য ও গৃহপালিত। চামড়া শিল্পে প্রধানতঃ শেষোক্ত পশুর চামড়া ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের চামড়া শিল্প ও চামড়া রপ্তানি নির্ভর করে প্রধান গৃহপালিত পশু গরুর উপর। এর পর ছাগল, ভেড়া ও মহিষ। কোরবানির ঈদের সময়ই মূলতঃ বেশীর ভাগ চামড়া সংগৃহীত হয়ে থাকে এবং সেগুলোই সারা বছর প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানী করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকের এক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে গাবদি পশুর সংখ্যা ৫ কোটির মত। এর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার শতকরা হার যথাক্রমে ৪৬.৪৫, ১.৪৪, ৫.১৩ ও ১.৮৬ (ইসলাম, ১৯৯৪)। কোরবানির ঈদে বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশ লাখ গবাদি পশু কোরবানি হয়ে থাকে। এর মধ্য গরুর চামড়া ১৮ লাখ; খাসি, ছাগল ও ভেড়া প্রায় ৩ লাখ (বাবর মীর ও করিম ১৯৯৪)। সারণী ১ এ বিশ্ব এবং বাংলাদেশে গবাদি পশুর সংখ্যা দেখানো হল।

সারণী- ১ বিশ্ব এবং বাংলাদেশে গবাদি পশুর সংখ্যা

(হাজার)

পশু		১৯৮০	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯৪
গরু	বিশ্ব	১,২১.৯,৭৫৬	১২,৭৭,৩৪৫	১,২৯৬৪১	১২,৯৪.৬০৪
	বাংলাদেশ	২৫,০৫৩	২৩,০১৫	২৩,২৪৪	২৩,৫০০
মহিষ	বিশ্ব	১২১,৭৩২	১,৩৭,৬৪৬	১,৩৯,২৩৬	১,৪২.১৮৯
	বাংলাদেশ	৪৭৪	৭৩৩	৭৭২	৮১০
ভেড়া	বিশ্ব	১০,৮৭,৯৮৫	১,১৯৯,০৩৭	১,২১,৫৬৩৩	১,২০২.৯২০
	বাংলাদেশ	৭৫০	৮৩৭	৮৭৩	৯০০
ছাগল	বিশ্ব	৪,৬৫,৩৪৮	৫,৬৯,৩৬৯	৫৭৮,০৬৫	৫৯৪.২৮৬
	বাংলাদেশ	১০,৫৬৯	১৯,৬০৪	২১,০৩১	২২,০০০

উৎস ঃ বাবর ও অন্যান্য ১৯৯৪

গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ মিলিয়ে আমাদের দেশে সারাবছরে প্রায় ২০কোটি বর্গফুট চামড়া পাওয়া যায়। এই চামড়ার ৪০ শতাংশই আসে কোরবানি থেকে। এই সময়ে প্রাপ্ত চামড়ার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় আট কোট বর্গফুটের মত। এই চামড়ার অধিকাংশই ফাইল গ্রেডের । সংখ্যা হিসাবে আমাদের দেশে বার্ষিক গড়ে

দেড়কোটি পিস চামড়া উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে ছাগল ৯০ লাখ পিস, গরু ৪৫ লাখ পিস, ভেড়া ১০ লাখ পিস এবং মহিষ ২ লাখ পিস। আর কোরবানির সময় গরু মহিষ মিলিয়ে ১৫ লাখ পিস এবং ছাগল ভেড়া মিলিয়ে ৪৫ লাখ পিস চামড়া পাওয়া যায় (রহমান, ১৯৯৮)।

সাধারণত প্রথমে পশুর চামড়া সংগ্রহ করে লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। চামড়ার সবচেয়ে বড় কাঁচাবাজার হল লালবাগের পোস্তা । সংগৃহীত লবণ মিশ্রিত এসব চামড়া লালবাগের পোস্তায় সরবরাহ করা হয়। এখান থেকে চামড়া হাজারীবাগের ট্যানারিগুলোতে স্থানান্তর করা হয় ক্রাস্ট, ফিনিশড ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করার জন্য। ঢাকা শহরের কসাইটুলী, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও কাপ্তানবাজারেও কাঁচা চামড়া বেচা কেনা হয়। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্নস্থানে থেকে সারাদিনই পোস্তায় চামড়ার চালান আসে। সাধারণতঃ গ্রাম্য কসাইরা সংগ্রহকৃত চামড়া লবণ মিশ্রিত করে সপ্তাহান্তে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা পাইকারের কাছে বিক্রয় করেন। স্থানীয় বাজার থেকে একজন স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যখন চামড়া নিয়ে আসেন তখন মূল বাজারে আসার আগেই একদল ক্রেতা চামড়া কিনে নেন। এদেরকে বলা হয় ফড়িয়া। এসব ফড়িয়াদের মধ্যে আবার ছোট ছোট ব্যবসায়ী আছেন যাদের পুঁজি অপেক্ষাকৃত কম তারা ছোট ফড়িয়া হিসাবে পরিচিত। এরা স্থানীয় ক্রেতাদের কাছ থেকে ৫-১০ টা চামড়া ক্রয় করে বড় ফড়িয়াদের কাছে বিক্রি করেন। বড় ফড়িয়ারা একসাথে অনেক চামড়া ক্রয় করে আড়তে ভাড়ায় জমা রাখেন অথবা আড়ৎদারদের কাছে বিক্রি করেন। লবণ দেয়া চামড়া আড়তে ১০-১২ দিন রাখা হয়। আড়ৎ থেকে চামড়া কিনে ট্যানারিতে নিয়ে যাওয়া হয় (প্রবাহচিত্র দ্রষ্টব্য)। সেখানে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা করা হয়।

উৎপাদক হতে ট্যানারি পর্যন্ত চামড়ার প্রবাহচিত্র

উৎপাদক → কসাই → স্থানীয় পাইকার বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী →

→ ছোট ফড়িয়া → বড় ফড়িয়া → আড়ৎদার → ট্যানারি

চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রধান তিনটি স্তর রয়েছেঃ ওয়েট ব্লু, ক্রাস্ট ও ফিনিশড। চামড়া ছাড়ানোর পর চামড়া পাকা করতে যেসব স্তরে তাকে প্রক্রিয়াজাত করা হয় তার কয়েকটি স্তর হচ্ছেঃ (১) চামড়া গুদামে আনয়ন

(২) মেশিন ঘরে আনয়ন (৩) শুকানো (৪) জীবানুনাশক উপকরণ মিশ্রিত জলে ডুবানো (৫) ঘুর্ণায়মান ড্রামের ভিতরে রক্ষিত চুনের জলে ফেলা (৬) পশম ও মাংশ ছাড়ানো (৭) চুন অপসারণের ব্যবস্থা অবলম্বন (৮) পাকা করার প্রথম পর্যায় (৯) নিঙরানো ও প্রসারিতকরণ (১০) পাকা করার দ্বিতীয় পর্যায় (১১) শ্রেণীভুক্তকরণ (১২) পৃথকীকরণ ও চাঁছন (১৩) ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর রেখে রং লাগান (১৪) তৈলাক্তকরণ (১৫) পুনঃশুকান (১৬) মসৃণ ও উজ্জ্বলকরণ (১৭) পরিস্কারকরণ (১৮) চকচকেকরণ (১৯) ইস্ত্রিকরণ (২০) মাপন, বাছাইকরণ ও নির্দিষ্টমান মাফিক ক্রমভুক্তকরণ (হক, ১৯৮৮)।

চামড়ার স্থায়ী সংরক্ষণের জন্য তিন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি হলো মিনারেল ট্যানেজ, ভেজিট্যাবল ও এলডিহাইড। আধুনিক জগতে মিনারেল ট্যানেজের মধ্যে ক্রোম ট্যানেজের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। ক্রোমট্যানড হাইডস এর ভিজা অবস্থায় বা স্তরকে ওয়েট ব্লু ক্রোম ট্যানড বলা হয়। এই অবস্থায় চামড়া সরাসরি ব্যবহার উপযোগী হয় না। ব্যবহারপযোগী করার জন্য কী কাজে ব্যবহার করা হবে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্লু স্তরের চামড়া পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা হয়। ওয়েট ব্লু স্তর থেকে ব্যবহারের উপযোগীর পূর্ব পর্যন্ত স্তরকে ক্রাস্ট বলা হয়ে থাকে। এই স্তরের চামড়াও পুরোপুরিভাবে ব্যবহারযোগ্য নয়। ক্রাস্ট চামড়াকে ফিনিশিং রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও আকর্ষণীয় করার পরই তা ফিনিশড চামড়া হিসাবে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন জুতা, ব্যাগ, বেল্ট, পার্স ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয় (ইসলাম, ১৯৯৪)।

বাংলাদেশের ছাগলের চামড়া পৃথিবী বিখ্যাত। উত্তরবঙ্গে যে সমস্ত ছাগলের চামড়া হয় তা গুণগত ভাবে অত্যন্ত চমৎকার । আমেরিকার খরিদ্দারগণ বাংলাদেশের চামড়াকে সর্বোৎকৃষ্ট চামড়া বলে স্বীকার করে নিয়েছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর ক্রোম টেনড চামড়ার মান ঠিক করে দেওয়ার উদ্দেশ্য ১৯৭৪ সালে সরকারী গেজেটে মান বিষয়ক নিয়মাবলী সম্বলিত বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। সেখানে চামড়াকে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। শ্রেণী হিসাবে গরুর চামড়া ৮ বর্গফুট হতে ২৪ বর্গফুট এবং ছাগল ও ভেড়ার চামড়া আড়াই বর্গফুট হতে ৭ বর্গফুট পর্যন্ত হতে পারে বলে ধরে নেয়া হয়। চামড়ায় ছুরির কাটা ও রোগদুষ্ট অংশ, জোঁয়াল জনিত ঘাঁ বা বেতের আঘাতের চিহ্ন থাকলে এর মান কমে যায়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের উপর এক জরিপ চালিয়ে বাংলাদেশের অনেক চামড়াতে বিভিন্ন দোষ চিহ্নিত করেছে।

যেমনঃ ছাড়ানোর সময় ছুরির কাটা, চামড়ায় গরুর রোগের চিহ্ন, পোকা ধরা চামড়া, চামড়ায় ঘাঁ বা শিং এর আঘাতের চিহ্ন, চামড়ায় জোঁয়ালের দাগ ও লাঠির গুতোর দাগ, আলপিনের দাগ,হেচঁড়ানোর দাগ এবং পঁচা লাগা চামড়া।

বাংলাদেশে চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও মুনাফা

বিদেশে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে তাই প্রতিবছর চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে। এদেশে উৎপন্ন চামড়াজাত দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্যাগ, জ্যাকেট, পার্স, ভেস্ট কোট, বেল্ট, মানিব্যাগ, হ্যান্ড ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ, হ্যাভার স্যাক, ফটোস্ট্যান্ড, মেকআপ বক্স, স্যুটকেস, ব্রীফকেস, পাসপোর্ট কভার, অর্নামেন্ট বক্স ইত্যাদি। বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের বেশী চাহিদা ইউরোপ ও আমেরিকার শীতপ্রধান দেশগুলোতে। অ্যাপেক্স ট্যানারী, ঢাকা হাইড এন্ড স্কিন, ঢাকা লেদার, বাংলাদেশ লেদার, বেঙ্গল লেদার, হাবীব ট্যানারী, কোহিনুর লেদার এসব কোম্পানীর তৈরী চামড়াজাত পণ্যের বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। ইতালী, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানী, পোল্যান্ড, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের চামড়ার পোশাক অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ শিল্পে দেশ ও বিদেশের বাজারের জনপ্রিয় নাম আড়ং। ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডায় নিজস্ব শো-রুমের মাধ্যমে আড়ং বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশী চামড়াজাত দ্রব্য বিক্রি করছে। বৈচিত্রময় ডিজাইন ও মানের কারণে দেশীয় বাজারে আড়ং ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে দেশে ১৫টি বড় আকারের চামড়ার জুতা কারখানা রয়েছে। এগুলো জুতা রপ্তানিতে সক্ষম । অন্যদিকে প্রায় ২ হাজার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রয়েছে। যেগুলো স্থানীয় চাহিদা পূরণের জন্য তৈরী করে থাকে (মানিক, ১৯৯৯)। বিশ্ববাজারে দ্রুত বর্ধনশীল চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে চামড়াজাত দ্রব্য বিশেষ করে চামড়ার ব্যাগ ও জুতা রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে। বাংলাদেশে গরু ও ছাগলের চামড়া উৎপাদনের পরিমাণ ১৮ মিলিয়ন বর্গফুট । এর মধ্যে ১৫-১৮ শতাংশ চামড়া স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট ৮২-৮৫ ভাগ চামড়া রপ্তানি করা হয়। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে মোট রপ্তানি আয়ের ১৩% অর্জিত হয় (উল্যাহ, ১৯৯৯)।

১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছর পর্যন্ত ৭ বছরে বাংলাদেশ হতে মোট ৯৬৩.০৫ মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া রপ্তানি করা হয়। ১৯৯১-৯২ হতে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর পর্যন্ত ৪ বছরে চামড়া রপ্তানি পরিমাণ ১২.৫৪ শতাংশ হারে বাড়লেও ১৯৯৫-৯৬ এবং ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে তা ১০.৫৪ শতাংশ হারে কমেছে।

বর্তমানের অবস্থা আরো উদ্বেগজনক। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যমতে, ১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৮ বছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ মোট ১৫৫৮.৯২ মিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। এর মধ্যে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বাবদ আয় হয় ১৬৪.৩৭ মিলিয়ন ডলার (উল্যাহ, ১৯৯৯)। চামড়াজাত পণ্যের মধ্যে জুতা রপ্তানি করে ১৯৯০-৯৭ অর্থবছরে আয় হয় ৮০.৯৩ মিলিয়ন ডলার। ১৯৯৮৫-৮৬ অর্থবছর থেকে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর পর্যন্ত ১০ বছরের চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি আয়ের পরিমাণ সারণী ২-এ উপস্থাপন করা হল।

সারণী ২ঃ চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি আয়ের পরিমাণ

(কোটি বর্গফুট ও কোটি টাকায়)

সন	রপ্তানির পরিমাণ	রপ্তানি আয়
১৯৮৫-৮৬	৭.২৬	১৮০.২৪
১৯৮৬-৮৭	১৩.৭৫	৪০৯.৭০
১৯৮৭-৮৮	১১.৭৬	৪৫৫.২০
১৯৮৮-৮৯	১২.৭৬	৪৩৪.৫০
১৯৮৯-৯০	১৫.৭২	৫৮৪.২৪
১৯৯০-৯১	১০.১৪	৪৭৩.৫১
১৯৯১-৯২	১২.৮০	৫৪৯.৭৫
১৯৯২-৯৩	১৩.৮৬	৫৭৪.৬২
১৯৯৩-৯৪	১৫.৭৬	৬৭০.১৬
১৯৯৪-৯৫	১৬.৭৮	৮৪৪.৪৪

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বাংলাদেশে চামড়া রপ্তানির পরিমাণ কমছে তবে চামড়ার ব্যাগ জুতা ইত্যাদি রপ্তানি বাড়ছে (খালেক, ১৯৯৯)। এই বৃদ্ধির হার খুব একটা বেশী নয় (সারণী-৩)। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ রপ্তানিমুখী চামড়ার জুতায় বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। চামড়ার জুতা তৈরীতে বাংলাদেশ বেশ সুবিধাজনক স্থানে রয়েছে। বিদেশে চামড়াজাত পণ্যের চাহিদার কারণ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ এক জোড়া চামড়ার জুতা তৈরী করতে খরচ হয় ৩২ ডলার, দক্ষিণ কোরিয়া এবং থাইল্যান্ডে খরচ হয় যথাক্রমে ২৩.৫০ ডলার ও ১৮.৫০ ডলার। অন্যদিকে বাংলাদেশে একজোড়া জুতা উৎপাদন করতে খরচ হয় মাত্র ১৪ ডলার। উন্নত দেশ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর চেয়ে আমাদের শ্রম খরচ অনেক কম। ফলে জুতা উৎপাদানেও খরচ অনেক কম লাগে। ১৯৯৩ সালে জাপানের চামড়া শিল্পের একজন শ্রমিকের প্রতি ঘন্টায় মজুরির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩.৬৫ ডলার। অন্যদিকে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, তাইওয়ান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত ও

পাকিস্তানে এ মজুরির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪.৪৪ ডলার, ১১.৬১ ডলার, ৫.৭৬ ডলার, ৩৮.৫ ডলার, ০.৫৬ ডলার ও ৪.৪৪ ডলার। অথচ বাংলাদেশে একজন দক্ষ চামড়া শ্রমিকের প্রতি ঘন্টা মজুরি ছিল মাত্র ০.২৩ ডলার। তুলনামূলক কম মূল্যের জন্য বিদেশীরা বাংলাদেশ হতে চামড়াজাত পণ্য ক্রয় করে। সরকার এখাতকে রপ্তানিমুখী শিল্প হিসাবে ঘোষণা করেছে (কায়সার,১৯৯৫)।

সারণী-৩ চামড়া সেক্টরের রপ্তানি আয়ের শ্রেণী বিন্যাস

(মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

অর্থ বছর	চামড়া রপ্তানি	চামড়ার ব্যাগ রপ্তানি	চামড়ার জুতা রপ্তানি	চামড়া জাত পণ্যের মোট রপ্তানি
১৯৯৪-৯৫	২০২.০৮	৬.৩৩	১২.৫৪	২২০.৯৫
১৯৯৫-৯৬	২১১.৭০	৬.৯৬	১৯.১৩	২৩৭.৭৯
১৯৯৬-৯৭	১৯৫.২৬	৩.৮১	১৭.৭৮	২১৬.৮৫
১৯৯৭-৯৮	১৯০.২৮	৫.৪৭	৩৮.০২	২৩৩.৭৫

উৎস ঃ খালেক ১৯৯৯।

বিদেশী বিনিয়োগের জন্য চামড়া শিল্পই বর্তমানে সর্বোত্তম ক্ষেত্র। এদেশে বিদেশী বিনিয়োগ এ্যাক্ট, ১৯৮০ এর মাধ্যমে বাইরের বিনিয়োগকারীদের জন্য সব ধরনের সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এখানে একজন বিদেশী তার একশ ভাগ মালিকানায় একটি রপ্তানিমুখী চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। চট্টগ্রাম ও ঢাকার রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় সব ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে। বিদেশী নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট ও ভিসা প্রদানকে সরকার সর্বোচ্চ বিবেচনায় রেখেছে। বিদেশী বিনিয়োগকারী যে কোন সময় তার মূলধন ও লভ্যাংশ প্রত্যাহারের অধিকারী।

বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের সমস্যা

সুষ্ঠু জাতীয় নীতিমালার অভাবঃ চামড়া সংগ্রহ, মজুতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু জাতীয় নীতিমালা নেই। চামড়া শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য বিশেষ প্রয়োজন একটি চামড়া নীতি। অথচ আজো দেশের জন্য একটি উপযোগী চামড়া নীতি প্রণীত হয়নি। ৯২ সালে একটি চামড়ানীতি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। সেই কাজ সম্পন্নও হয়। এই খসড়া নীতি বাংলায় প্রণীত হয়েছিল, পরে এর একটি ইংরেজী অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দিলে তারও উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু সেই অনুবাদ কাজের অগ্রগতি হয়নি বলেই জানা গেছে।

এছাড়া মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কতিপয় সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও এর যথাযথ কার্যকারিতা দেখা যায় না।

ঋণদানে ব্যাংকের জটিলতাঃ বাংলাদেশ সরকার ট্যানরিগুলোকে ঋণ দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিলেও তার তেমন একটা কার্যকারিতা নেই । চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ পাঁচটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ১৯৯৮ সালে কোরবানির চামড়া ক্রয়ের জন্য ১৯৩ কোটি ১৭ লাখ টাকা মঞ্জুর করে এবং আরও ৪৯ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুরীর প্রক্রিয়াধীন রাখা হয়। ১৯৯৭ সালে কোরবানির চামড়া ক্রয়ের জন্য ব্যাংকগুলো ২০৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করেছিল। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাংকগুলো তিন কিস্তিতে ঋণ প্রদানের নিয়ম চালু করে। ঈদের আগে প্রথম কিস্তির টাকা দেয়া হয়। প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে চামড়া কিনে দেখানোর পর ঈদ পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির টাকা দেয়া হয়। ব্যাংকের এই ধাপে ধাপে ঋণ দান ও মনিটরিং ব্যবস্থা এবং ঋণদানের জটিল প্রক্রিয়া চামড়া ব্যবসায়ীদের নিরুৎসাহিত করছে।

ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ হওয়া ঃ সরকার ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানিকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে গোটা চামড়া শিল্পে অচলাবস্থা দেখা দেয়। ক্রমে ক্রমে শ'দেড়েক ট্যানারী বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এ শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ও এর উপর নির্ভরশীল ট্যানারী, মালিক, শ্রমিক, কর্মচারী, রপ্তানিকারক, কাঁচা চামড়ার ক্ষুদে ক্রেতা, আড়ৎদারসহ প্রায় ১ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তানও দীর্ঘদিন ওয়েট ব্লু ও ফিনিশড চামড়া একই সঙ্গে রপ্তানি বহাল রেখেছে। শতকরা একশ ভাগ চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি করার সুযোগ সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত এসব দেশ ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ করেনি। কিন্তু বাংলাদেশ চামড়া ফিনিশড করার অবকাঠামো তৈরী ও যন্ত্রয়াণ সম্পূর্ণ করার পূর্বেই ওয়েট ব্লু রপ্তানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

চোরাচালানে চামড়া পাচার ঃ ফিনিশড লেদারের পাশাপাশি ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানি না হওয়ায় দেশে উৎপাদিত চামড়ার এক বৃহদাংশ দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছরই কোরবানি ঈদের সময় দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ গরু ও ছাগলের চামড়া চোরাচালান হয়ে পাচার হয়ে যায়। অর্থের অভাবে দেশীয় বেপারীরা অনেক সময় মাঠে নামাতে পারে না। এ সুযোগে ভারতীয় চামড়া ব্যবসায়ীরা তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ চামড়া কিনে নিয়ে

যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশী পাচার হয় কালো রঙের ছাগলের চামড়া। ব্যবসায়ীদের ধারণা, ১৯৯৭ সালে কোরবানির ৬০ ভাগ চামড়াই পাচার হয়ে গিয়েছিল (রহমান, ১৯৯৮)।

আমলাতান্তিক জটিলতাঃ বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য উদ্যোক্তাদের কম হয়রানির স্বীকার হতে হয়না। বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিদের দুয়ারে ধর্ণা দেয়া, তোসামোদ করা, ফাইল নড়াচড়ায় কড়ির কেরামতি ইত্যাদি কারণে উদ্যোক্তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

সুদক্ষ শ্রমিকের অভাবঃ গুণগত মান ধরে রাখার জন্য যে ধরনের পর্যাপ্ত সুদক্ষ শ্রমিক থাকা দরকার তার অভাব রয়েছে। ফলে এ শিল্পের উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ হচ্ছে না।

হাজারীবাগ থেকে ট্যানারী শিল্পের স্থানান্তরঃ হাজারীবাগ থেকে ট্যানারী শিল্পকে দেশের অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি প্রায় ২০ বছরের পুরনো। কখনও স্থির করা হয়েছে সাভার এলাকা, পূবাইল কিংবা চট্রগ্রামে রোডের পাশে মেঘনা নদীর তীরবর্তী কোন এলাকা। কিন্তু এসব সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ঘটেনি। অন্তর্বর্তী সময়ে হাজারীবাগে ট্যানারী শিল্পের বিস্তার ঘটেছে অপরিকল্পিতভাবে। সেখানকার অবকাঠামোগত সুবিধাগুলো যেমন রাস্তাঘাট, ড্রেন, পয়ঃনিস্কাশন, বিদ্যুৎ ও পানি ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এসব কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চামড়া শিল্প। অন্যদিকে কোন বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট না থাকায় এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। পার্শ্ববর্তী বুড়িগঙ্গা নদীর পানি ও জলজ সম্পদ হুমকির মুখে।

আইন শৃঙ্খলা ঃ হাজারীবাগে ট্যানারির গোড়াপত্তনের সময় এলাকাটি ফাঁকা থাকলেও এখন তা একটি ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকা। যে কারণে সেকানকার ট্যানরিগুলো প্রায়শঃ বিভিন্ন আইন শৃঙখলার সমস্যা ও অনাহুত শ্রমিক সমস্যায় আক্রান্ত হচেছ। এতে করে উৎপাদনের ক্ষতি হচ্ছে । শিল্প এলকার চরিত্র অক্ষুন্ন থাকছে না।

ঋণ খেলাপী ঃ চামড়া খাতে খেলাপী ঋণ বর্তমানে আশংকাজনক পর্যায়ে রয়েছে। এখাতে প্রদত্ত ঋণের ৫৯.৩৮ শতাংশই খেলাপী ঋণ। এ কারণেই চামড়াখাতে ঋণদানে ব্যাংকগুলোর অনীহা। ব্যাংকগুলোর বক্তব্য হলো, সরকারের নির্দেশে

প্রতিবছর বাধ্য হয়ে এই খাতে বিপুল পরিমাণ ঋণ দিতে হয় চড়া সুদে কলমানি মার্কেট থেকে টাকা ধার করে। কিন্তু এর অধিকাংশই আর ফেরত আসে না। আর ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া সত্ত্বেও এক শ্রেণীর চামড়া ব্যবসায়ী ও ট্যানারি মালিক পাইকারদের পাওনা পরিশোধ করে না। ১৯৯৮ সালে ট্যানারি মালিকরা ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে পাইকার ও আড়ৎদারদের বকেয়া টাকা পরিশোধ না করে নিজেরাই চামড়া খরিদ করেছে। আড়ৎদারদের টাকা না দেওয়ায় গ্রামে গঞ্জে টাকা যায়নি। ফলে গ্রামগঞ্জে পানির দরে চামড়া বিক্রি হয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ পর্যন্ত চামড়া খাতে মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ২১২ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। যার মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ৭২০ কোটি ২৮ লাখ টাকা (রহমান,১৯৯৮)। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে দেশের চামড়া শিল্প খাতে দেয়া ব্যাংক ঋণের এক করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী চামড়া শিল্পে ৮টি সরকারী খাতের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনার পরিমাণ হচ্ছে মোট ঋণের ৫০ ভাগ। ৮শ ১৫ কোটি টাকাই খেলাপি ঋণে পরিণত হচ্ছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩০শে জুন ৯১ পর্যন্ত ২৪০টি প্রতিষ্ঠানের কাছে বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৩শ ৮৪ কোটি টাকা (বায়রন, ১৯৯৯)। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী ক্রাস্ট ও ফিনিশড চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চামড়া শিল্পের উৎপাদিত পণ্য একশত ভাগ বিদেশে রপ্তানি করলেও আজ পর্যন্ত এ শিল্পকে ১০০ ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি। ফলে প্রায় ৯০ ভাগ বিদেশী কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল গার্মেন্টস ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রায় ৯০ ভাগ দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহারকারী চামড়া শিল্প। ফলে এর উৎপাদান খরচ বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে।

দূষিত পরিবেশঃ নবাবগঞ্জ, হাজারীবাগ, মনেশ্বর রোড, ঝিগাতলার দক্ষিণাংশের রাস্তাঘাট ও আশপাশের পরিবেশ অত্যন্ত দূষিত হয়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে ট্যানারির বর্জ্য অংশ ও ময়লা আবর্জনার স্তুপ পড়ে থাকে। এগুলোর দুর্গন্ধে চতুর্দিকের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি সূত্রে জানা গেছে এদেশে পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,৩২২ । ট্যানারি শিল্পগুলোই পরিবেশকে বেশী মাত্রায় দূষিত করে। পরিবেশ দূষণ রোধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখনো সম্ভব হয়নি। ফলে এলাকার পরিবেশ মারাত্মক দূষিত হওয়ায় জনজীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। ট্যানারিতে যে সব রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়

সেগুলো যে শুধু এলাকার পরিবেশকেই দূষিত করে তা নয়, নদীর পানিকেও দূষিত করে থাকে।

দাদন ব্যবসাঃ পোস্তা এলাকার বেচাকেনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জমজমাট দাদন ব্যবসা। এক শ্রেণীর ফড়িয়া আছেন যাদের নগদ কোন পুঁজি নেই । তারা আড়ৎদারদের কাছ থেকে একদিনের জন্য ঋণ নেন। ঋণ নিয়ে তারা বেড়িয়ে যান কাঁচা চামড়ার খোঁজে । চামড়া কেনা বেচায় লাভ হলে আড়ৎদারদের সুদসহ টাকা একইদিনে ফেরত দিয়ে আসেন। আর চামড়া বিক্রি করতে না পারলে আড়তে রেখে দেয়। এতে ফড়িয়াদের চামড়া রাখার জন্য আড়তের ভাড়া এবং সুদসহ ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হয়।

চামড়ার ক্ষতসৃষ্টি ও কাটাপড়াঃ বাংলাদেশের গবাদিপশুর বিকাশ স্বাস্থ্যসম্মত ও রোগমুক্ত হয় না বলে চামড়া শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মারাত্মাকভাবে । এদেশে উৎপাদিত চামড়ার মাত্র ৩১ ভাগ ১ থেকে ৪নং গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাকীগুলো এর নীচে থাকে। দেশে বিদ্যমান গবাদি পশু পরিচর্যা ও রোগ নিরাময় কেন্দ্রগুলোর তৎপরতা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল । গবাদি পশু জবাইয়ের পর চামড়া ছাড়ানোর প্রক্রিয়া এখানে সম্পন্ন হয় মূলতঃ অদক্ষ হাতে। দেশে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সজ্জিত কোন আধুনিক কসাই খানা নেই। বছরে গাবাদি পশুর মাত্র ১০ভাগ জবাই হয় প্রাচীন আমলের কসাইখানায়। বাকিটা হাটবাজার কিংবা রাস্তার ধারে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে করা হয়। অদক্ষ হাতে জবাই ও চামড়া ছাড়ানোর ফলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ চামড়া নষ্ট হয়। আমাদের দেশে চামড়া কাটা পড়ার ব্যাপারটি বিশেষ করে কোরবানির সময় ঘটে থাকে। কোরবানির পশুর চামড়া ছাড়াতে অনেক অনভিজ্ঞ উৎসাহী অংশ নেয়। এ কারণে বছরে লোকাসান হয় প্রায় ৫০ কোটি টাকা।

চামড়া শিল্পের সমস্যা সমাধানে কর্মনীতি

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের জটিল ও বহুমুখী সমস্যা সমাধানের জন্য এখনই পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে নিম্নরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করা যায়ঃ

১। চামড়া শিল্পের জন্য সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকরী ভূমিকা পালন । চামড়া শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা মনে করেন শিল্পকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের দিকে নিতে হলে সরকারকে অবশ্যই একটি সময়োপযোগী আধুনিক গতিশীল

নীতি অবলম্বন করতে হবে। অতীতে চামড়ার ব্যাপারে নীতিমালার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি বলেই চামড়া সেক্টরে রুগ্ন শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে।

২। সামগ্রিক বিবেচনায় হাজারীবাগ এলাকায় ট্যানারি শিল্পের অবস্থান এদেশের চামড়া শিল্পের প্রসারে একটি বড় প্রতিবন্ধক। একে স্থানান্তরিত করা উচিত ঢাকার অদূরে । সাভার কিংবা ডেমরা অথবা অন্য কোন যুৎসই এলাকা, যেখানেই হোক না কেন, সেখানে অবশ্যই একটি কেন্দ্রীয় এফুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থাকতে হবে। সরকারকে সকল অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। লেদার পল্লী গড়ে তোলার সূদুর প্রসারী পরিকল্পনার ভিত্তিতেই জায়গা অধিগ্রহণ করতে হবে। যাতে ট্যানারী এলাকার পাশেই স্থাপন করা যায় জুতা, লেদার, গার্মেন্টর্স ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরীর কারখানা। চামড়া থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন বাইপ্রোডাক্টের কারখানা স্থাপনের বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩। ট্যানারীর পরিবেশ উন্নত করে আধুনিক মেশিনপত্র স্থাপন করা দরকার। অপারেটর, সুপারভাইজার, ও দক্ষ শ্রমিক তৈরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। মার্কেটিং ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের দিকে ট্যানারী শ্রমিকদের নজর দিতে হবে।

৪। বাংলাদেশের চামড়া শিল্পকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরার জন্য বিদেশের দূতাবাসগুলোকে বিশেষ নির্দেশ দেয়া দরকার। আমাদের গার্মেন্টস, সিরামিক, চা পৃথিবীময় সমাদৃত। এর পাশে চামড়া শিল্পকে তুলে ধরে বিশ্ববাজারের মুখ আমাদের দিকে ফেরানো সম্ভব। ভারত তার চামড়া শিল্পের প্রসার ও প্রচারের জন্য নিউইয়র্কে একটি মার্কেটিং এজেন্সীর সহায়তা নিচ্ছে। আমাদেরকেও এধরনের এজেন্ট ঠিক করতে হবে।

৫। রপ্তানিমুখী শিল্প হলে একশ ভাগ পণ্যই রপ্তানি করতে হবে এ অবস্থার পরিবর্তন করে ৭৫ ভাগ রপ্তানির সঙ্গে ২৫ ভাগ দেশীয় বাজারে বিক্রির সুযোগ দেয়া উচিত। এতে করে লোকাল মার্কেটের পণ্যের মান ভাল হবে এবং রপ্তানিতে বাতিল হওয়া পণ্য বিক্রির একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। এতে দেশের লোকেরা আমাদের উৎপাদিত পণ্য দেখে ও কিনে গর্বিত হবে নিঃসন্দেহে।

৬। চামড়া শিল্পের আমদানী রপ্তানিতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী আমলাতান্ত্রিক জটিলতাগুলো দূর করে এখাতেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ কমাতে হবে।

৭। চামড়ার মান বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য ভারতের সিএলআরআই এর মত একটি প্রতিষ্ঠান করা যায়। লেদার টেকনোলজী কলেজের উন্নয়নের পাশাপাশি জুতা শিল্পের উন্নয়নের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

৮। সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পকে বিশ্ববাজারে আরো বেশী গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়িত করা দরকার। চামড়া শিল্পের মাধ্যমে আরো বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হলে এই শিল্পকে আধুনিকায়ন করা দরকার। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে চামড়া শিল্পকে আরো অগ্রসর করা সম্ভব।

৯। বাংলাদেশে কাঁচা চামড়া ওয়েট ব্লু বা সামান্য ট্যান করা কারখানাই বেশী। চামড়া শিল্পকে সম্ভাবনাময় খাত হিসাবে গড়ে তুলতে হলে ছোট আকারের ট্যানারিগুলোকে চামড়া ক্রাস্ট ও ফিনিশড করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা দরকার। সাথে সাথে যে সব আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যানারি রয়েছে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে তোলা দরকার। এ ধরনের উদ্যোগ নিলে বাংলাদেশকে ক্রাস্ট ও ফিনিশড চামড়া রপ্তানির অন্যতম দেশ হিসাবে বিশ্ববাজারে পরিচয় করা সম্ভব।

১০। চামড়া প্রাকৃতিক বাই প্রোডাক্ট; এতে উৎপাদন খরচ নেই। প্রক্রিয়াকরণ করে রপ্তানি করলে ভ্যালু এডিশন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী যেমন, ব্যাগ, পার্স, বেল্ট, জুতা, গার্মেন্টস ইত্যাদি রূপে রপ্তানি করলে মূল্য কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

১১। কাঁচা চামড়ার সুষ্ঠু, নিয়মিত ও পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী অধিক হারে গরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়ার খামার গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর ফলে চামড়ার চাহিদা মেটার পাশাপাশি দেশে আমিষের যোগান বৃদ্ধি পাবে এবং খাঁটি গরুর দুধ গুড়া দুধের বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হবে। ফলে রক্ষা পাবে শিশু। রক্ষা পাবে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা।

১২। বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন, চামড়ার ব্যাগ ও জুতা রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে এ দুটি পণ্য লেদার সেক্টরের ঐতিহ্য ফিরে পেতে সাহায্য করতে পারে। তাই আমাদের পাকা চামড়া রপ্তানির

পরিবর্তে চামড়ার তৈরি জুতা, ব্যাগ, বেল্ট প্রভৃতি রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া উচিত।

১৩। আমাদের চামড়া শিল্পের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রথম প্রয়োজন এ শিল্পটিকে একশত ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসাবে ঘোষণা করা। পাশাপাশি কাঁচা ওয়েট ব্লু ক্রাস্ট ও ফিনিশড চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর আমদানী অবাধ শুল্ক ও গ্যারান্টি মুক্তকরণ। চামড়া শিল্পকে গতিশীল এবং বিদেশী বাজার দখলের লক্ষ্যে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বিনা শুল্ক ক্যামিকেলস আমদানী বা চামড়া রপ্তানির এফওবি মূল্যের উপর শতকরা হারে ডিউটি ড্র-ব্যাক ধার্য করা প্রয়োজন। রপ্তানিমুখী এ শিল্পের যন্ত্রাংশ আমদানী শুল্ক ও গ্যারান্টি মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

১৪। গরু জবেহ করার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক কসাইখানা স্থাপন করা উচিত। এসব কসাইখানায় উৎকৃষ্ট উপায়ে চামড়া ছাড়ানোর ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১৫। চোরাচালানে চামড়া যাতে পাচার হতে না পারে সেজন্য সীমান্ত এলাকায় চামড়ার সংগ্রহ কেন্দ্র খুলতে হবে। প্রতিবছর কোরবানি ঈদের পর হাজার হাজার পিস চামড়া পাচার হয়ে যায়। এদিকে সরকারের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

১৬। চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। চামড়া শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের সুদক্ষকরণে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৭। জাতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহে চামড়া শিল্পের ব্যাপক প্রচার করা প্রয়োজন।

১৮। ট্যানারীগুলোকে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়া এবং জাতীয় স্বার্থে চামড়া শিল্পের জন্য পৃথক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

১৯। চামড়ার জন্য বাধ্যতামূলক মান প্রয়োগ করতে হবে।

২০। দেশে অনেক ভূয়া চামড়ার কারখানা আছে। তারা চামড়া শিল্পের নামে রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রাংশ আমদানী করে চড়া দামে অন্যত্র বিক্রি করে। ঐসব ভূয়া কারখানার বিলুপ্তি ঘটাতে হবে।

২১। চামড়াজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদানের লক্ষ্যে আরও অধিক পরিমাণ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উচিত। এতে করে বেকার সমস্যাও কিছুটা সমাধান হবে।

এছাড়া চামড়া খাতের বিরাজমান সমস্যাদি নিরসনের লক্ষ্যে এবং চামড়া শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের সুপারিশকৃত নিম্নোক্ত দাবীসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে (উদ্দিন, ১৯৯৯)।

১। পোশাক শিল্পের ন্যায় চামড়াখাতে ক্রাস্ট, ফিনিশড ও চামড়াজাত দ্রব্যের ২৫ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান।

২। ট্যানারি শিল্পের খুচরা যন্ত্রাংশ শুল্কমুক্ত আমদানীর সুযোগ প্রদান করা।

৩। ফুটওয়্যার ও চামড়া শিল্পের উন্নয়নে একটি আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করা।

৪। চামড়া কাউন্সিল বাস্তবায়ন ।

৫। বন্ধ ট্যানারির ঋণ কেইস টু কেইস ভিত্তিতে পুনঃ তফসিলীকরণের মাধ্যমে বন্ধ সময়ের সুদ ও দন্ড সুদ মওকুফ করে অবশিষ্ট ঋণ সুদবিহীন ব্লক একাউন্ট নিয়ে নতুন করে ঋণ দিয়ে এদের সক্রিয় করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬। রপ্তানিমুখী চলমান ট্যানারি শিল্পগুলিকে ৩ শতাংশ সুদে ৫ বছরের জন্য মরাটোরিয়াম প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৭। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট অবিলম্বে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া। এবং

৮। পরীক্ষামূলকভাবে ৩ বছরের জন্য ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ।

বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ

চামড়া শিল্প দেশের মোট রপ্তানী আয়ের ১৩% যোগান দেয়। সমস্যাসমূহ কাটিয়ে উঠতে পারলে এ শিল্প দেশের রপ্তানি পণ্যের শীর্ষে অবস্থান করতে পারে। এর ইতিবাচক বিষয়াদির মধ্যে রয়েছেঃ (১) উন্নত মানের চামড়া উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ খুবই উপযোগী; (২) বাংলাদেশের চামড়া

শিল্প আন্তর্জাতিক মানে স্বীকৃত, বিশেষ করে, বাংলাদেশের কালো ছাগলের চামড়া খুবই উন্নত মানের যা পৃথিবীর যে কোন চামড়া শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম; (৩) আন্তর্জাতিক চামড়া বাজারে যে সব দেশ আমাদের প্রতিযোগী হিসেবে পরিচিত তাদের অনেকেই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত চামড়া দিয়ে চাহিদা পূরণ করতে পারে না বলে তাদেরকে চামড়া আমদানী করতে হওয়ায় আন্ত র্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চামড়ার চাহিদা অত্যাধিক; (৪) সম্পূর্ণভাবে দেশীয় কাঁচা মালে উৎপাদিত হওয়ায় সার্বিক মুনাফা বেশী; (৫) বাংলাদেশের সহজলভ্য শ্রমশক্তি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে এবং দেশের ইপিজেডগুলোতে জুতা ও অন্যান্য পণ্য ব্যাপক ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে।

হংকং, ইটালী, স্পেন, জাপান ও তাইওয়ানের লেদার মার্কেট আমাদের প্রতিযোগী হলেও তাদেরকে বাংলাদেশ হতে চামড়া আমদানী করতে হয়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে উল্লেখিত দেশগুলো বাংলাদেশ হতে মোট ১৪৩.১৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের চামড়া আমদানী করে। এ চামড়ার পরিমাণ ছিল ঐ বছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানিকৃত চামড়ার ৭৩.২২ শতাংশ। এর মধ্যে হংকং একাই ৪১.১৯ শতাংশ বা ৮০.৫২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বাংলাদেশী চামড়া ক্রয় করে(উল্ল্যাহ, ১৯৯৯)।

এই শিল্পের মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষিত, স্বাক্ষর ও নিরক্ষর লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। চামড়া সংগ্রহকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদানে সারা দেশে কয়েক লক্ষ লোক নিয়োজিত। অন্যান্য যে কোন শিল্পে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির তুলনায় চামড়া শিল্পে কম পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরী পোশাক শিল্প শীর্ষে হলেও এর বেশীরভাগ কাঁচামাল বিদেশ হতে আমদানী করতে হয়। তদুপরি ২০০৪ সালে কোটা ব্যবস্থা তুলে দিলে পোশাক শিল্প মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে বলে ইতোমধ্যে অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, সে হিসেবে তুলনামূলকভাবে চামড়া শিল্পের ভবিষৎ অগ্রগতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল

উপসংহার

চামড়া বাংলাদেশের প্রচলিত পণ্য তালিকায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় চামড়া শিল্প বিকাশের জন্য এদেশের আবহাওয়া ও পশু সম্পদ বহুলাংশে অবদান রেখেছে। ১৯৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত

এই শিল্পের প্রবৃদ্ধি ছিল বেশ মন্থর। ১৯৮২ সালের পর থেকে এক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। ফলে ওয়েট ব্লু এর পাশাপাশি ক্রাস্ট ও পাকা চামড়ার উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ট্যানারী শিল্পকে প্রদত্ত সরকারী উৎসাহ ও রপ্তানি নীতিতে ক্রমান্বয়ে ওয়েট ব্লুকে নিরুৎসাহিত করে ক্রাস্ট ও পাকা চামড়াকে অধিক সুযোগ প্রদান এই পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করে। ১৯৯০ সালে ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা এদেশের চামড়া শিল্পে বিরাট প্রভাব ফেলে। বিশ্বব্যাংকের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মোট চামড়া উৎপাদনের ২% -৩% উৎপাদিত হয়ে থাকে বাংলাদেশে। বিশ্বের গবাদি পশুর ১.৮% এবং ছাগল ৩.৭% রয়েছে বাংলাদেশে । বিদেশে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের ছাগলের চামড়া পৃথিবী বিখ্যাত।

১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ৮ বছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ মোট ১,৫৫৮.৯২ মিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। এর মধ্যে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বাবদ আয় হয় ১৬৪.৩৭ মিলিয়ন ডলার। গত কয়েক বছরে রপ্তানিমুখী চামড়ার জুতা তৈরীতে বাংলাদেশ বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে চামড়া উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান হলেও চামড়া শিল্পের হাজারো সমস্যা এই শিল্পকে সঠিক ভাবে বিকশিত হতে দিচ্ছেনা। সুষ্ঠু জাতীয় নীতিমালার অভাব, ঋণ দানে ব্যাংকের জটিলতা, ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ হওয়া, চোরাচালানে চামড়া পাচার, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সুদক্ষ শ্রমিকের অভাব, চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি ও কাটাপড়া, ট্যানারী শিল্পের অস্বস্তিকর পরিবেশ, আইন শৃঙখলার অবনতি, ঋণ খেলাপী ইত্যাদি নানা সমস্যা চামড়া শিল্পের উপর মারাত্মক হুমকী সৃষ্টি করছে। এই সব সমস্যা সরকার এবং ট্যানারী শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও উন্নয়ন সংস্থাসহ দেশের দেশপ্রেমিক দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যৌথভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের চামড়া রপ্তানি বাণিজ্যের শীর্ষে অবস্থান করতে পারে কারণ উপযোগী পরিবেশ ও আবহাওয়া। বাংলাদেশের চামড়া শিল্প আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত এবং আমাদের এই চামড়া সম্পূর্ণ দেশীয় কাঁচামাল । এ কথা অনস্বীকার্য যে, চামড়া আমাদের একটি সফল রপ্তানি সামগ্রী । এ সাফল্য অর্জনে খুব বেশী সময় লাগেনি। সঠিক পরিকল্পনা আর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের চামড়া শিল্পকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

তথ্য নির্দেশকা

ইসলাম, মুজাহিদুল (১৯৯৪) "অবহেলিত চামড়া শিল্পঃ সমস্যা, সম্ভাবনা ও প্রতিকার"। *প্যানোরামা*, ৩রা আগষ্ট।

উদ্দিন, এম. কামাল (১৯৯৯) "সংকটে চামড়া শিল্প"। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ আগষ্ট।

উল্লাহ, মুহাম্মদ রফিক (১৯৯৯) "সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ নভেম্বর।

কামাল, ম. (১৯৯৯) "আমাদের চামড়া শিল্পঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা"। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ এপ্রিল।

কায়সার, আশরাফ (১৯৯৫) "চামড়া শিল্প আসছেঃ রপ্তানিতে আরেক ধাপ"। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৭জুলাই।

খালেক, এম. এ.(১৯৯৯) "চামড়ার জুতা ও ব্যাগ রপ্তানির সম্ভাবনা"। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ জুলাই।

বাবর, সালাউদ্দিন, আযম মীর ও মীযানুল করিম (১৯৯৪) "বাংলাদেশের চামড়া শিল্পঃ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত"। *প্যানোরোমা*, ৩ আগষ্ট।

বায়রন, রেজাউল করিম (১৯৯৯) "চামড়া শিল্পঃ ৮১৫ কোটি টাকা ঋণ খেলাপি"। *ভোরের কাগজ*, ২নভেম্বর।

মানিক, নুরুজ্জামান (১৯৯০) "চামড়ার জুতা রপ্তানির সম্ভাবনা"। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ সেপ্টেম্বর।

রহমান, কাওসার (১৯৯৮) "চামড়া শিল্পে কেন এই ধস?"। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২০ এপ্রিল।

হক, ছৈয়দ আহমুদুল (১৯৮৮) *চট্রগ্রামের শিল্প ও বাণিজ্য*, চট্রগ্রাম, চেম্বার প্রেস, পৃঃ ১০৪।

হুসেইন, দেলোয়ার ও ফজলুল করিম (১৯৯৬) "চামড়া শিল্প সমস্যা ও সম্ভাবনা"। *সাপ্তাহিক রোববার*, ১ডিসেম্বর।

হোসেন, মাহমুদ (১৯৮৮-৮৯) "রপ্তানি উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধাসমূহ এবং রপ্তানিমুখী পোশাক ও চামড়াজাত দব্য রপ্তানিতে তাদের প্রভাবঃ একটি মূল্যায়ন"। *জার্নাল অব বিজনেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন*, ভলিউম ১৪-১৫, সংখ্যা ৫।

হোসেন, মোঃ বেলায়েত(১৯৮৭) "বাংলাদেশী চামড়ার রপ্তানি বিপননঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা"। *জার্নাল অব বিজনেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন*, ভলিউম ১৩, সংখ্যা ৫, ডিসেম্বর, পৃঃ ৫৫।

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী,
পঞ্চদশ সংখ্যা
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

রাজনীতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আবেদা সুলতানা*

Participation of women in political and administrative decision making : Bangladesh contex. Abeda Sultana

Abstract. The article is a research study to identify the extent and nature of participation of women in political and administrative decision making bodies. Five parameters Viz. political parties, parliament, cabinet, top administration and union parishad have been selected to analyze the present situation and suggest future course of action. The Constitution of Bangladesh permits to special measures to ensure women's participation in all walks of public life. But, Bangladesh is still a male dominated country where women's special needs are hardly reflected in the national policies of the country. The major reasons which work as barriers to increasing women's decision making roles in Bangladesh are restriction on free movement of women, multiple roles of women in the family, lack of eductation, economic dependence and most importantly absence of a democratic and secular social structure. The present regime has attempted to break the tradition and engage women ministers in productive sectors such as agriculture, environment and education. Another positive change is participation of women in the Union Parishad through direct election. This is definitely a departure from passivity to activity for women at the grassroots level.

রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশল জনগণের সার্বিক কল্যাণেই পরিচালিত। আর জনগণ অর্থ্যাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশলের সমান অংশীদার। ফলে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য বিষয় হলো নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাধিকার, যা নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নয়নের পূর্বশর্ত। যে সব ক্ষমতা সর্ম্পক নারীর জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করে সেগুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরে ক্রিয়াশীল। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসকল বাধা দূরীভূত হবে, অথ্যার্ৎ নারীর ক্ষমতায়ানের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা তৈরী হবে এবং এ ব্যবস্থাই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও গণতন্ত্রকে ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে।

রাজনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোয় জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ নারী সমাজের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কখনোই সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সমাজের প্রতিটি

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমতার ভিত্তিতে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেই কেবলমাত্র গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে গুণগত মান অর্জন করবে। সুতরাং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মূল হাতিয়ার হলো রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশগ্রহণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান অংশগ্রহণ শুধু সাধারণ ন্যায়বিচার বা গণতন্ত্রের জন্যই প্রয়োজন তা নয়, বরং নারীর স্বার্থরূপে বিবেচনা করার মতো একটি প্রয়োজনীয় শর্তও বটে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রকৃত ক্ষমতা অর্জিত না হলে সরকারী নীতির ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে সমতা আনা সম্ভব কি না তাতেও বেশ সন্দেহ আছে। এ কারণে রাজনৈতিক জীবনে নারীর সমান অংশগ্রহণের বিষয়টি নারীর অগ্রগতির জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর প্রেক্ষাপট সম্পৃক্ত করা না হলে ক্ষমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব নয়। আর রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন বিষয়টি নারীর সার্বিক অবস্থানের উন্নয়নের সাথে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিত্বের একটি স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস নেয়া হলো।

গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিত্বের বর্তমানে চালচিত্র অনুসন্ধানই গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনীতি তথা রাজনৈতিক দল আইনসভা, মন্ত্রীসভা, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় অর্থ্যাৎ ইউনিয়ন পরিষদে কী পরিমাণ নারী প্রতিনিধিত্ব করছে

তার একটি বিশ্লেষণমূলক চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস রয়েছে। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

ক) নারী উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্ত বাংলাদেশের সচেতন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ততার প্রকৃতি; খ) বাংলাদেশের নারী সমাজ রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কী রূপ ভূমিকা রাখছে; এবং গ) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোতে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তথা উন্নয়নের জন্য এটা কতটা জরুরী।

গবেষণা কর্মটিতে মূলতঃ গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যায়নের মাধ্যমে পরিমাণগত সারণীও ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা কর্মে অনুসৃত প্রধান পদ্ধতিগুলো হচ্ছেঃ

প্রথমত, প্রাসঙ্গিক প্রকাশনা জরীপের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন লেখকের লেখা, জার্নাল, দৈনিক পত্র-পত্রিকা, বই পত্র, সমীক্ষা ও অন্যান্য প্রকাশনাকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, গবেষণা কর্মের প্রয়োজনে বাংলাদেশের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, রাজনৈতিক দলসমূহের অফিস, নির্বাচন কমিশন অফিস-এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে যোগযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, আইনসভা, মন্ত্রীসভা, এবং প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় ও নিম্ন পর্যায়কে ঘটনা (কেইস) হিসেবে পর্যবেক্ষণ করে নারী প্রতিনিধিত্বের হার তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি, তথ্য শ্রেণীকরণ ও বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিষয় ও সময় অনুযায়ী শ্রেণীকৃত করা হয়েছে এবং শ্রেণীকৃত তথ্যাবলী গুণগত ভাবে তত্ত্ব ও যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণের এককসমূহ

রাজনীতি মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য বাস্তবতা। প্রতিটি মানুষই কোননা কোন ভাবে, কোন কোন সময়ে কোন না কোন ধরনের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে জড়িত হয় (ধল, ১৯৯৫: ১)। সুতরাং মানুষ হিসাবে নারীও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন কোন জীব নয়। আর রাজনৈতিক দল হলো জনগণ ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। দলই নানাবিধ কার্যক্রম দ্বারা দলীয় নীতি ও প্রার্থীর পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে নির্বাচনে নিজস্ব প্রার্থী জাতীয় সংসদে প্রেরণের প্রয়াস নেয়। সুতরাং রাজনীতিতে ও রাজনৈতিক দলে নারীর অস্তিত্ব ও অবস্থানের সঙ্গে তাদের সংসদে উপস্থিতি বা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীতার সমীকরণ করা যায়। রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের নির্দেশক হলো আইনসভায় তার প্রতিনিধিত্ব। আইনসভা ও বিশেষভাবে মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য নির্বাহী সংস্থার স্তরে নারীর উপস্থিতি নারীর রাজনৈতিক ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল অস্তিত্বের মাপকাঠি। আর ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে স্থানীয় সরকারের মূল ভিত্তি যার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনগোষ্ঠীকে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

রাজনীতিতে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরের পদে এবং আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্ব থাকলে তারা অনেক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। যেমনঃ

রাজনৈতিক অগ্রাধিকার পুনঃনির্ধারণ করা; নতুন ধরনের বিষয় রাজনৈতিক এজেন্ডায় নিয়ে আসা যেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়, মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটায় ও সেসব বিষয়ে করণীয় নির্দেশ করে; এবং মূল রাজনৈতিক এজেন্ডায় নতুন প্রেক্ষিত সংযোজন করা, প্রভৃতি (UN, 1995:82)। ফলে নারীর স্বার্থ ও সমস্যাকে জাতীয় স্বার্থ এবং সমস্যার অখন্ড অংশ হিসাবে দেখা ও নারী উন্নয়ন পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য মাত্রা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গৃহিত হবে। তাই এ সকল ক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণের একক হিসেবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

সরকারের উচ্চ পর্যায়ে নারী ঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের এলাকাসমূহ ঐতিহ্যগত ভাবেই পুরুষের সংরক্ষিত এলাকা হিসেবেই রয়ে গেছে, এবং নারীরা সরকারী পদসমূহে ধীরে ধীরে আসীন হতে শুরু করলেও উর্ধ্বতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর সংখ্যা এখনও নিদারুণ ভাবে কম। এ ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর নেতৃত্বের একটি বৈশ্বিক চিত্র নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র : সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ঃ বিশ্ব প্রেক্ষাপট

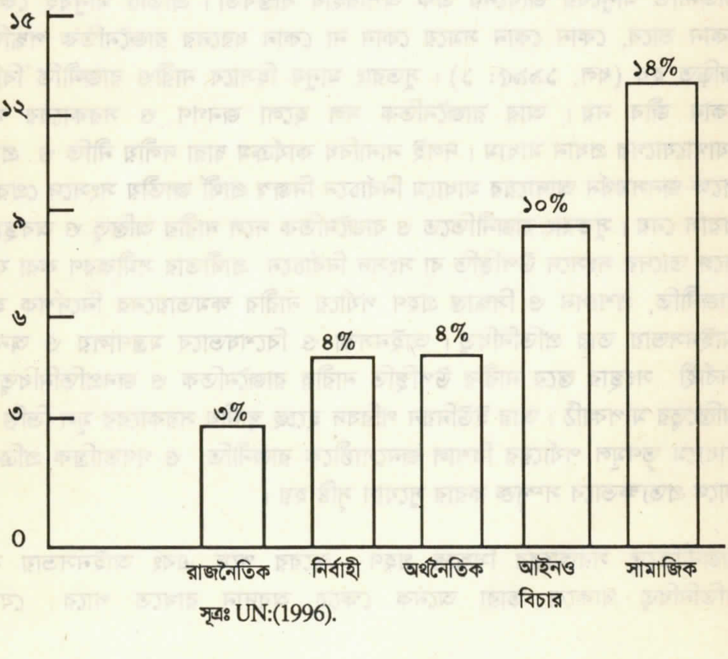

সূত্রঃ UN:(1996).

বিশ্বে মন্ত্রী পর্যায়ের মাত্র ৭% পদে নারীরা রয়েছেন। এই সামান্য সংখ্যার ভেতরেও তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবারসহ সামাজিক বিষয়ক ক্ষেত্রগুলোতে বেশীর ভাগ নিযুক্ত। বিশ্বে সামাজিক শ্রেণীর মন্ত্রী পর্যায়ের পদে নারীর মোট সংখ্যা ১৪% অথচ রাজনৈতিক মন্ত্রী পর্যায়ের পদে নারীর সংখ্যা ৩% এবং নির্বাহী পদে নারীর সংখ্যা ৪%। অর্থনৈতিক শ্রেণীতে মন্ত্রী পর্যায়ের পদে নারীর সংখ্যা ৪%। আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান কিছুটা ভালো, সেখানে ১০% পদে নারীরা রয়েছেন। সুতরাং রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সরব পদচারণা ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা হয়ে উঠলেও এখনো বিশ্বজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ খুবই নগণ্য। আজও দুনিয়ার কোথাও নারীরা একজন পুরুষের মত পরিপূর্ণ রাজনৈতিক মর্যাদা উপভোগ করে না (রহমান, ১৯৯৮ : ৫২)।

বাংলাদেশের চিত্র

(ক) রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলে নারী

বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে দুই নেত্রীর প্রাধান্য ও প্রচন্ড দৃশ্যমানতার পাশাপাশি বিরাজ করছে প্রায় নারী শূণ্যতা। স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়, সর্বস্তরে, বিশেষ ভাবে কাঠামোগত রাজনীতিতে নারীর অবস্থান মোটেই ব্যাপক, সংগঠিত বা সুসংহত নয় (Chowdhury, 1995: 16)। অর্থ্যাৎ রাজনীতির অঙ্গনে নারীর অবস্থানের যে বাস্তবতা তা পরস্পর বিরোধী। উপরিকাঠামোতে নারীর যে অবস্থান তা অধিকাঠামোতে প্রতিফলিত হয়নি। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপক ক্ষেত্রে নারী প্রায় সম্পূর্ণ রূপে অনুপস্থিত। রাজনীতি অঙ্গনে নারীর এই প্রান্তিক অবস্থান মূলতঃ পরিবার ও সমাজে তাদের অধস্তন অবস্থানের প্রতিফলন। যার ফলে রাজনীতিতে নারীর অংশ হয় গৌণ কিংবা অদৃশ্য।

ম্যাককরম্যাক বলেছেন যে, মহিলারা যে তিনটি কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে না সেগুলো হলোঃ (ক) সামাজিকীকরণে ভিন্নতা (খ) কম শিক্ষিত এবং (গ) হীনমন্যতা বা সনাতন মনোভাব যা সংস্কার থেকে সংক্রামিত হয়। মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না বা করে না কারণ তারা পরিবারকেন্দ্রিক গৃহকর্তার মতে ভোটদান করে, রাজনীতি করলে “অথোরিটারিয়ান ফিগার” হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য পরিবারভিত্তিক এবং শিশুকল্যাণ বিষয়ের মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ (Bambewala, 1983: 2)।

রাজনীতির কিছু পেশাগত বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের সমাজে নারী চরিত্রে আরোপিত গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন, রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে কোন বাধাধরা সময়সীমা নেই, রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য অবারিত চলাচল ও সম্পর্ক স্থাপন যা আমাদের সমাজের সংরক্ষণশীল মনোভাবের পরিপন্থী। নারীর বহুমাত্রিক পারিবারিক দায়িত্বশীলতা, শিক্ষার অভাব সর্বোপরি অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা রাজনীতির অঙ্গনে নারীর উপস্থিতি ও সম্ভাবনাকে দুর্বল করে রাখে। এছাড়া নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন একটি গণতান্ত্রিক সেক্যুলার সমাজব্যবস্থা। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার অভাব সমাজের সকল কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মতাদর্শিক সীমাবদ্ধতা তৈরী করে। এছাড়াও নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য যে ধরনের সুযোগ সুবিধা এবং সমর্থনের প্রয়োজন রাষ্ট্রীয়ভাবে তার প্রতিফলন সমাজে নেই বরং এক ধরনের দ্বৈততা প্রতিফলিত, ফলে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত । বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কমিটি অবলোকনেও বিষয়টি স্পষ্ট যে নারী শুধু রাজনীতিতে নয়, রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতেও তাদের সংখ্যা নগণ্য। নীচের সারণী বিষয়টির সত্যতা তুলে ধরে (সারণী-১)।

সারণী-১ঃ প্রধান রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটিসমূহ	মোট সদস্য	নারী সদস্য
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	৩৬	৫
	কার্যনির্বাহী কমিটি	৬৪	৫
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৪	১
	জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটি	১৬৪	১১
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩১	২
	জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটি	২০১	৬
জামাতে ইসলাম	মজলিশ -ই- শুরা	-	০
	মজলিশ-ই - আমলা	-	০

সূত্র ঃ রাজনৈতিক দলসমূহের অফিস থেকে ব্যক্তিগত ভাবে সংগৃহীত: ৩রা জুন ১৯৯৯।

উল্লেখ্য যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বর্তমান সরকার অত্যন্ত উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্রিয়, তাদের এ আন্তরিকতার প্রকাশ নারী বিষয়ক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে সুস্পষ্ট। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও কার্যনিবাহী সংসদের তালিকা অবলোকনে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দলীয় পর্যায়ে নেই। যেমনঃ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদ গঠিত হবে, ১) সভাপতি, ২) সভাপতিমন্ডলী, ৩) সাধারণ সম্পাদক, ৪)

সম্পাদকমন্ডলী, ৫) কোষাধ্যক্ষ, এবং ৬) ২৯ জন সদস্য সমন্বয়ে। এক্ষেত্রে সভাপতি, আমরা জানি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সভাপতিমন্ডলীর মধ্যে আছেন মাত্র দুই জন মহিলা, আর সম্পাদক মন্ডলীর মধ্যে আছেন দুই জন মহিলা। এছাড়া দলের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে আর কোন মহিলা নেই। এমনকি মহিলা সম্পাদিকা কে? সে বিষয়ে কোন নাম নেই (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১৯৯৭)। বিষয়টি নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের দিকে থেকে "নেতিবাচক" বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক উদ্যোগকে প্রকৃতভাবে কার্যকর করার জন্য দলীয় পর্যায়ে উল্লেখ্যযাগ্য অনুপাতে নারী সদস্য নিয়োগ প্রয়োজন।

উপরের চিত্র থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, রাজনৈতিক দলে অধিক হারে নারীর অংশ গ্রহণ না থাকায় প্রক্রিয়াগত ভাবে রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার পত্র বা ঘোষণা পত্রে নারীর সমস্যা রাজনৈতিক ইস্যুতে রূপান্তরিত হয়নি, ফলে কোন রাজনৈতিক দলই নারীর সমস্যাকে কোন ভাবে প্রাধিকারযুক্ত করে না। এ সম্পর্কে দলে কোন এজেন্ডা নেই, নেই কোন কর্ম পরিকল্পনা বা আইনগত ও নির্বাচনী সংস্কারমূলক কোন সুপারিশ। বিভিন্ন দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দলগত কর্মসূচীতে জেন্ডার সমতার প্রসঙ্গটির উপর খুব কমই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন আওয়ামী লীগ মানবাধিকারের নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল উন্নয়ন ও উপার্জনমুখী কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং নারী অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণার পর্যাক্রমিক বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। বামপন্থী দলসমূহ স্বীকার করে যে, জেন্ডার সমদর্শিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জামাত -এ-ইসলামী জেন্ডার সমতায় বিশ্বাস করে না। উপরন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক পৃথক ব্যবস্থার পক্ষপাতী। বিষয়টি পরিস্কার যে, বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলেই নারীদের অবস্থার উন্নতি এবং নারী পুরুষ সমানাধিকার অর্জনের জন্য নারীর অংশীদারিত্বের প্রসঙ্গ রাজনীতির ভাষায় (Political discourse) সন্নিবেশিত হয়নি। সুতরাং এ অবস্থার আশু পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন, কারণ রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় নীতি অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত বলে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান নারীর সার্বিক অর্ধস্তনতার সূচক। আবার নারীর অধস্তনতা যে সমাজে প্রায় সর্বস্তরে গৃহীত এবং যে সমাজে পরিবেশগত ভাবে নারীর সমস্যা, সমাধান ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নেই, সে সমাজে নারীর রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ সীমিত এবং রাষ্ট্রীয়

নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ (নাজমা ও অন্যান্য, ১৯৯২: ৪৬-৪৭)। সুতরাং নারীকে রাজনীতির মূল স্রোতধারায় (Main stream) সম্পৃক্ত হতে হবে। রাষ্ট্রীয় জীবনে রাজনৈতিক দলই প্রধান চালিকা শক্তি, সুতরাং নারীর রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং রাজনীতির পরিমন্ডলে নারী সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণে নারীর রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই মর্যাদার ভিত্তিতেই তারা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশ নিতে পারেন এবং তার মধ্যে দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্যহীন একটি সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারেন। তা না হলে নারীরা যা পারেন তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দয়া দাক্ষিণ্যেরই ফলশ্রুতি (Menon, 1994ঃ 39)।

রাজনীতি পুরুষ প্রধান এবং পুরুষ কেন্দ্রিক, বা এনড্রোসেনট্রিক। পুরুষ কর্তৃক নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রনীতিতে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজন সংযোজিত ও প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা সাধারণতঃ ক্ষীণ থাকে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পর্যায়ে অত্যন্ত অপ্রতুল হারে প্রতিনিধিত্বের ফলে নারীর সমতা ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত পাবলিক পলিসি সম্পর্কিত সমস্ত সিদ্ধান্ত পুরুষের এখতিয়ারে রয়ে যায়, যাদের এ ধরনের বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরূপ আগ্রহ নাও থাকতে পারে (DAW : 1990 21)। ফলে রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে নারীর অধস্তনতা রিএনফোর্সড হচ্ছে বা জেন্ডার অসমতা দূরীকরণের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বা নীতি গৃহীত হচ্ছে না (Chowdhury, 1995: 19) এবং এটি স্বতসিদ্ধ যে, কোন অসুবিধা ভোগী শ্রেণীর অবস্থার উন্নতিকল্পে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যাবশ্যক (Chowdhury and Almasud, 1997 : 65)। অতএব রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ যেমন একদিকে প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পৃথক নারী সংগঠনের যার মাধ্যমে নারী সমস্যার কর্মসূচী নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। উপরন্তু সার্বিক বিচারে বলা যায়, রাজনৈতিক দল ও বৃহত্তর পরিসরে সমাজকে নারীর সমস্যা ও সমাধানে সম্ভাব্য পন্থা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে তোলার দায়িত্ব সেসব নারীর ওপর বর্তায় যারা এই পুরুষ শাসিত সমাজে নেতৃত্বের অধিকার অর্জন করেছেন।

(খ) আই্ন সভায় নারী

বাংলাদেশের আইনসভা বা জাতীয় সংসদ একক ভৌগোলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ আসন এবং মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনের সমন্বয়ে গঠিত। সংসদে বর্তমানে ৩০০টি সাধারণ আসনের অতিরিক্ত ৩০টি সংরক্ষিত আসনের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার গোড়পত্তন ঘটেছিল ১৯৭২ সালে । রাজনীতিতে আসতে নারীদের মধ্যে উৎসাহ যোগানো এবং

পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সে সময় সংবিধানে ১০ বৎসরের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণের বিধি সংযুক্ত হয়। উল্লেখিত বিধি অনুযায়ী সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচিত ৩০০ সদস্য সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এই বিশেষ সুবিধা ১৯৭৮ সালে ১৫ বছরের জন্য বাড়ানো হয়। এ সময়ে আসন সংখ্যাও উন্নীত করা হয় ৩০এ । পরবর্তীতে আরেক দফা সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বেড়েছে, যা ২০০১ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

প্রথম সংসদ থেকে বর্তমানের সপ্তম সংসদ পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনে মোট ১৬৬ জন মহিলা সদস্য মনোনীত হয়েছেন। এদের মধ্যে একাধিকবার সংসদ সদস্য হয়েছেন ৮ জন। সংসদীয় এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাজনীতিতে নারীর আগমন ত্বরান্বিত করেছে এমন কথা বলা যায় না। এ মুহূর্তে জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচিত নারী সাংসদ রয়েছেন মাত্র ৭জন। ১৯৯১ এর সংসদে সরাসরি নির্বাচিত নারী ছিলেন ৫জন। অর্থ্যাৎ বৃদ্ধির হার খুব কম। সংরক্ষিত ৩০টি আসনে নারীদের নির্বাচন মূলতঃ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ট আসন লাভকারী দলের সদস্যদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত । ফলে নারী সাংসদগণ দেশের সমাজের কাজে নিজেদের দায়বদ্ধ মনে করেন না। তাই প্রচলিত ব্যবস্থায় নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায় অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছেন না।

অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিম্নহার লক্ষ্য করা গেলেও ১৯৭৩-১৯৯৬ পর্যন্ত নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের একটি ইতিবাচাক ধারা লক্ষ্যণীয়। বিগত বৎসরগুলির নির্বাচনী ফলাফল ও প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নারী প্রার্থী ক্রমান্বয়ে ভোটারদের কাছে তাদের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তারা রাজনীতির অঙ্গনে জেন্ডার উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা করে নিজেদের যোগ্য প্রার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছেন। নীচের সারণীতে সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা ও শতকরা হার দেখানো হলো (উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৬)।

সারণী-২ঃ সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা

বছর	নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সরাসরি ভোটে নারী জয় লাভ করেছে	উপর্বিচানে নারী জয়লাভ করেছে	মোট নারী জয়লাভ কারীর সংখ্যা	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	জাতীয় সংসদে নারী আসনের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	০	২	২	৩০	৯.৭
১৯৮৬	০.৩	৫	২	৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	০	৪	-	-
১৯৯১	১.৫	*৮	১	৫	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩৬	*১১	২	৭	৩০	১১.২১

*শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

সূত্র ঃ নারী বার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, উইমেন ফর উইমেন ১৯৯৬, নারী ও উন্নয়ন ।

১৯৯৬ সনের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। ৩০০টি আসনের জন্য মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫৭৪ জন। এর মধ্যে ২৮১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। ৩৬ জন নারী ৪৪টি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রধান প্রধান দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ৪ জন, বি.এন.পি ৩ জন, জাতীয় পার্টি ৩ জন, গণফোরাম ৭ জন নারীকে মনোনয়ন দিয়েছিলো (হোসেন, ১৯৯৮ঃ৭) সারণী ৩- এ ১২ই জুনের নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী প্রার্থীর সংখ্যা দেয়া হলো (উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৬)।

সারণী-৩ঃ ১২ই জুন, ১৯৯৬ এর নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা

দল	মোট মনোনয়ন সংখ্যা	মহিলা আসন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	৩০০	৪
বি. এন. পি	৩০০	৩
জাতীয় পার্টি	৩০০	৩
ন্যাপ মোজাফফর	১২৮	১
জাসদ (ইনু)	-	১
জাসদ (রব)	-	৭
গণফোরাম	-	১
বাংলাদেশ সামাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান)	-	২
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আন্দোলন	-	১
ভাসানী ফ্রন্ট	-	১
জাতীয় জনতা পার্টি	-	৪
বাংলাদেশ পিপল্স পাটি	-	২
জনদল	-	১
স্বতন্ত্র	-	৫
মোট	১০২৮	৩৬

সূত্রঃ নারী বার্তা, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন ১৯৯৬ উইমেন ফর উইমেন।

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র গণফোরাম ছাড়া অন্যান্য দলগুলো নারী প্রার্থী তেমন দেয়নি। প্রধান ৪টি দলের মধ্যে তিনটি দল- আওয়ামী লীগ শতকরা ১.৩ এবং অন্য দুটি দল বি.এন.পি এবং জাতীয় পার্টি শতকরা ১ভাগ নারীকে দল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন দেয় যা নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের নেতিবাচক একটি দিক। নির্বাচনে নারীরা জয় লাভ করতে সক্ষম হবেন কিনা, এ বিশ্বাস এখনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। যেখানে নারী সংগঠনগুলো শতকরা ১০ অথবা ১৫ ভাগের জন্য আন্দোলন, তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনা করছে সেখানে শতকরা একভাগ অথবা একভাগের সামান্য কিছু বেশী নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার অর্থই হলো নারীদের ওপর এখনও রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী হিসেবে আস্থা রাখতে পারছে না। অথচ লক্ষণীয় যে, মোট ২৫৭৪ জন পুরুষ প্রার্থীর মধ্যে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১৭৩০ জনের, অর্থ্যাৎ ৬৮.৫ শতাংশের। অন্যদিকে মোট ৪৮টি নির্বাচনী এলকার ৩০টিতে অর্থ্যাৎ শতকরা ৬২.৬ জন নারীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কাজেই এখনো জামানত বাজেয়াপ্তের দিক থেকে নারীরা পুরুষের তুলনায় কম আছেন। অন্যদিকে শেখ হাসিনা একটি কেন্দ্রে ভোট পেয়েছেন শতকরা ৯২.১৮ ভাগ (হোসেন, ১৯৯৮)। অতএব রাজনীতিতে ক্রমান্বয়ে নারী নিজের যোগ্যতার পরিচয় তুলে ধরছে এখন প্রয়োজন কেবল নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন।

সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন

সরাসরি নির্বাচিত না হলে জবাবদিহিতা থাকে না। অর্থ্যাৎ নারী সাংসদগণ নিজেদেরকে দেশের নারী সমাজের কাছে দায়বদ্ধ মনে করেন না। তাছাড়া প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদা বেশী, কারণ সহজেই মনোনীত সদস্যদের সংসদে দাবিয়ে রাখা যায়। সুতরাং সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রয়োজন। বাংলাদেশ আইন মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিল তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। তবে নারীরা যেহেতু রাজনীতিতে পুরুষের অনেক পরে এসেছে এবং রাজনীতি যেহেতু এখনও টাকা ও অস্ত্রের খেলা তাই বাস্তব বিবেচনায় এ বিষয়ে নারী সংগঠনগুলোর কিছু ভিন্নমত ও সুপারিশ আছে। যেমন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দাবি সংরক্ষিত আসন বাড়িয়ে ৬৪টি করা হোক। এতে প্রতি জেলায় অন্তত একজন নারী প্রতিনিধি থাকবে। উইমেন ফর উইমেনও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছে। এ সংগঠন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের শুধু মহিলাদের ভোটে নির্বাচনের পক্ষপাতী। নারীপক্ষ সংরক্ষিত আসন বাড়ানোর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নে মহিলা কোটা আরোপের সুপারিশ করেছে (অনন্যা, ১৯৯৮)। যেহেতু

বর্তমান সপ্তম সংসদ নারীর সংরক্ষিত আসনের শেষ সংসদ। এ কারণে এই মুহূর্তে মহিলা আসন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও বেশী জরুরী।

(গ) মন্ত্রী সভায় নারী

বর্তমানে বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রীসহ চারজন মহিলা মন্ত্রী হিসেবে অধিষ্টিত আছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে মহিলা মন্ত্রীগণ "নরম" বা কম গুরুত্বপূর্ণ বলে সচরাচর বিবেচিত এমন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। মেয়েলি বা ফেমিনিন বিষয় বলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও চিহ্নিত এমন সব মন্ত্রণালয়ের মহিলা মন্ত্রীদের যোগাযোগ ঘটেছে বাংলাদেশে। যথা সমাজকল্যাণ, মহিলা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কো-অপারেটিভ ও স্থানীয় সরকার ইত্যাদি। সুতরাং বিশ্বব্যাপী নারীমন্ত্রীদের দায়িত্বের "ক্ষেত্রে নরম" বা গুরুত্বপূর্ণ নয় এসব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বন্টনের প্রবণতা বাংলাদেশে বিদ্যমান ছিল। তবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও বি.এন.পি'র প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। বর্তমান সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য তিন জন মন্ত্রীর একজন কৃষি, খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রাণালয়ে, একজন বন ও পরিবেশ মন্ত্রাণালয়ে এবং আরেক জন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী। সুতরাং বাংলাদেশে মন্ত্রী সভার দায়িত্বের ক্ষেত্রে নারী এখন স্টেরিও টাইপ বা চিরাচরিত ছাঁচের বাইরে পা রেখেছেন। সারণী-৪ এ ১৯৭২-১৯৯৭ পর্যন্ত নারী মন্ত্রীদের শতকরা হার তুলে ধরা হল (সুলতানা, ১৯৯৮: ৫৭)।

সারণী - ৪ঃ মন্ত্রী সভায় নারী অংশগ্রহণের হার

সময় কাল	মোট মন্ত্রী	নারী মন্ত্রী	শতকরা হার
আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২-৭৫	৫০	০২	০৪
বি. এন. পি সরকার ১৯৭৬-৮২	১০১	০৬	০৬
জাতীয় পার্টি সরকার ১৯৮২-৯০	১৩৩	০৪	০৩
বি. এন. পি সরকার ১৯৯১-৯৫	৩৯	০৩	০৫
আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-অদ্যাবধি	২৪	০৪	০১৬

সূত্রঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১৯৯৫ এ পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদন ও সাম্প্রতিক তথ্য প্রবন্ধকার কর্তৃক নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে সংগৃহিত, ১৯৯৯।

উপরের সারণী থেকে এটি স্পষ্ট যে, জেন্ডারভিত্তিক ভাবে নারী রাজনৈতিক শক্তিতে দুর্বল- দলে, সংসদে ও নির্বাচনী এলাকায়। এর সাথে মন্ত্রী পরিষদে তাদের দুর্বল অবস্থানের একটা যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়।

(ঘ) প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারী

আধুনিক কালে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি প্রশাসনের সাথেই বেশী জড়িত। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় পদসমূহে নারী তেমন একটা নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পারেনি অথচ নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাকালে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে নারীর উচ্চকণ্ঠ এবং নারীর দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রশাসনের উচ্চ স্তরে সংযোজন হওয়া প্রয়োজন। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমতা নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনে কেবল একটি অভীষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রাই নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। নাইরোবী ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্র্যাটিজিতে (Nairoby Forward-looking Strategies) সত্যিকার ভাবে সমতাকে নারীর জন্য বাস্তবতায় পরিণত করতে হলে পুরুষের সঙ্গে ক্ষমতায় সমান অংশীদারিত্ব একটি মূল কৌশল (Jahan and et al. 1995) বলে বিবেচিত হয়, যা BPFA বা বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশান ঘোষিত নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত। সারণী-৫ এ বর্তমানে বাংলাদেশের প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারী অংশ গ্রহণের হার তুলে ধরা হলো।

সারণী- ৫ঃ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের নারী অংশগ্রহণের হার

পদ	পরুষ	নারী	মোট	%
সচিব	৪৮ জন	১ জন	৪৯ জন	২.০৮
অতিরিক্ত সচিব	৫৫ জন	১ জন	৫৬ জন	১.৮১
যুগ্ম সচিব	২৭২ জন	৩ জন	২৭৫ জন	১০১০
উপসচিব	৬৪২ জন	৬ জন	৬৪৮ জন	০.৯৩

সূত্রঃ লোক প্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে প্রবন্ধকার কর্তৃক সংগৃহীত; ৩রা জুন ১৯৯৯।

বাংলাদেশ সরকারের বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণ সকলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে জড়িত। বর্তমানে ২৯টি ক্যাডারে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৪২৬৭ এবং পুরুষের সংখ্যা ২৪,৮৩৫ জন। নিচের সারণীতে সরকারী প্রশাসনে নারী অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরা হলো (রহমান, ১৯৯৮: ১৩, রহমান, ১৯৯৮ঃ ৯)।

সারণী - ৬ঃ সরকারী চাকুরীতে নারী অংশগ্রহণের হার

সরকারী চাকুরীতে নারী	১৯৮৮ সন	১৯৯৩ সন	১৯৯৭ সন
প্রথম শ্রেণীর পদ মর্যাদা	৮.৫৪%	৭.৪৭%	৭.৫৪%
দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ মর্যাদা	৬.৩%	৭.৪৬%	৮.০৬%
তৃতীয় শ্রেণীর পদ মর্যাদা	৮.৯৫%	১১.৫৮%	১০.৬৬%

সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯৯৮।

উপরের সারণীতে সিদ্ধন্ত গ্রহণে নারী অংশগ্রহণের একটি ধীর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে এখনো কোন নারী অধিষ্ঠিত হয়নি। সারণী-৭ এ বিচার বিভাগীয় ক্যাডারে নারী অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরা হলো (Morshed, 1998)। অতি সাম্প্রতিক কালে পুলিশের উচ্চপদে চারজন মহিলা এস.পি. হয়েছেন (সারণী-৮)।

সারণী- ৭ বিচার বিভাগে নারী অংশগ্রহণ

কোর্টের প্রকার ভেদ	পুরুষ		নারী	
	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী
সুপ্রিম কোর্ট	১৩	-	-	-
ট্রাইবুনাল কোর্ট	০৮	-	০২	-
জজ কোর্ট	৫০৫	১৬	৪০	-
মেজিট্রেসি	২০০০	-	১৯২	-

সূত্রঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের রিপোর্ট, ১৯৯৫

সারণী -৮ ঃ পুলিশ প্রশাসনে নারী

পদমর্যদা	পুরুষ	নারী
প্রথম শ্রেণী	৭৩২	১২
দ্বিতীয় শ্রেণী	২২৫	২৫
কনস্টেবল	৭৯৮৫৯	২২০
মোট	৮০৮১৬	২৫৭

সূত্রঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের রিপোর্ট ১৯৯৫।

পরিকল্পনা কমিশন ও নির্বাচনে কমিশনের উচ্চ পদে কোন নারী নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য পদে কোন নারী এখনো অধিষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্রদূত পদে একজন নারী বর্তমানে দায়িত্ব প্রাপ্ত আছেন। কৃষি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পদে ১ জন নারী আছেন। সেনাবাহিনীতে একজন নারীকে বিগ্রেডিয়ার পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে।

সার্বিক অবস্থা অবলোকনে এটি প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নারীর উপস্থিতি এখনও নগণ্য। এদের সংখ্যা দশ শতাংশেরও কম। অথচ বর্তমানে উচ্চ পর্যায়ে ১০ শতাংশ এবং নিম্ন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত আছে কিন্তু এ কোটাও পূরণ হচ্ছে না।

বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণের স্বরূপ সন্ধানের এই প্রচেষ্টা থেকে দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার

প্রায় সর্বাংশেই পুরুষরা নিয়োজিত। সরকারী নীতি-নির্ধারণে নারীর প্রেক্ষিত ও সমস্যাসমূহ পুরুষ সঠিক ও পর্যাপ্তভাবে প্রতিফলনে সক্ষম নয়, তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে অধিক হারে নারীর উপস্থিতি প্রয়োজন।

(ঙ) ইউনিয়ন পরিষদে নারী

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারের কেন্দ্রাতিগ ক্ষমতার একটি প্রশাসনিক স্তর হলো স্থানীয় সরকার যার মূলভিত্তি ইউনিয়ন পরিষদ। তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠির রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম সোপান হল ইউনিয়ন পরিষদ। তাই স্থানীয় সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিটে প্রয়োজন নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব । এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইউনিয়ন পরিষদে যথাযথ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনগোষ্ঠিকে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭) নারীদের ৩টি (এক তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে নারীর ক্ষমতায়নে এটি একটি বিরাট অর্জন । ৯৭'এর নির্বাচনসহ বিগত নির্বাচনগুলোতে নারী প্রার্থীদের অবস্থান কোথায় ছিল তা সারণী-৯ এ তুলে ধরা হলো (Qadir, 1994: 6)।

সারণী ৯ঃ ইউনিয়ন পরিষদে নারী অংশগ্রহণের হার

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	মহিলা প্রার্থী	নির্বাচিত নারী চেয়ারপার্সন
১৯৭৩	৪৩৫২	---	১
১৯৭৭	৪৩৫২	---	৪
১৯৮৪	৪৪০০	---	৪+২=৬
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১(১%প্রায়)
১৯৯৩*	৪৪৫০	১১৫	১৩+১১=২৪
১৯৯৭**		---	২০

সূত্রঃ * নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান ও ডঃ সৈয়দা রওশন কাদির এর প্রবন্ধ এবং দৈনিক জনকণ্ঠ ১০ই মে ১৯৯৮।

শতবর্ষের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ স্থানীয় সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট ইউনিয়ন পরিষদে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ২৭ বছরে সর্বমোট ৬টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনেই প্রথম মহিলারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, বর্তমানে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারপার্সন ২০জন, ১১০ জন সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন এবং সংরক্ষিত আসনে ১২,৮২৮

জন নির্বাচিত হয়েছেন। '৯৭ নির্বাচনে যে কারণে বৈশিষ্টপূর্ণ তাহলো সেবারই একজন নারী প্রার্থী পাড়ার পুরুষদের কাছে নিজের জন্য ভোট চেয়েছেন। নির্বাচনী এই "চাওয়ার সামাজিক প্রভাব সুদূর প্রসারী কারণ পুরুষ নারীকে চিরদিন যে ভূমিকায় দেখে অভ্যস্ত এর মধ্যে দিয়ে সে দৃশ্যপট পাল্টে যাচ্ছে"। পূর্বের তুলনায় সেবারই গ্রামে মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশী ছিল। নির্বাচনের পরবর্তী দৃশ্য "চিরদিন নারী দুঃখের কথা বলেছে, অভিযোগ করেছে, শুনেছে পুরুষ। এখন নারীও অভিযোগ শোনে। তার কাছেও বিচার চায় মানুষ" (জনকণ্ঠ, ১০মে ১৯৯৮)। সুতরাং নারীর অগ্রযাত্রায় এটি নতুন সংযোজন। তবে বেশ কয়েকটি গবেষণা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে বেরিয়ে আসছে তা হচ্ছে মহিলা সদস্যগণ সভায় উপস্থিত কেন সীমিত পরিমাণে, উপস্থিত াকলে তাদের মতামতের প্রাধান্য দেয়া হয় না। সর্বোপরি সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবস্থান প্রান্তিক।

মতামত ও সুপারিশমালা

সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ বিষয়টি পরিস্কার, যদিও বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী নাগরিককে রাজনৈতিক অধিকারসহ (ধারা ৩৬-৩৯) সকল মৌলিক অধিকারসহ, জন প্রতিনিধিত্বশীল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করেনি (ধারা ৬৬-১২২), সংবিধান জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত আসনের বিধান করেছে (ধারা ৬৫) এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নারীর বিশেষ প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে (ধারা-৯), সংবিধান জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের নীতি বির্ধৃত করেছে (ধারা ৯), মৌলিক অধিকার হিসেবে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রদান করেছে (GOB, 1991) তথাপি বাংলাদেশ "প্যাটিয়ার্কাল" বা পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রই রয়ে গেছে । কারণ সরকারের বিভিন্ন স্ত রের অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থার স্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব ব্যাপকভাবে কম, এবং আইনসভায় রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে অগ্রগতি বলতে গেলে প্রায় নেই। নির্বাচক জনগোষ্ঠীর অর্ধেক যদিও নারী এবং নারীরা ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হবার অধিকার অর্জন করেছে তবু জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থাসমূহে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নারীর সংখ্যা এখনো অব্যাহতভাবে অনেক কম। ফলে রাজনীতি, রাজনৈতিক দল ও সরকারী কাঠামোয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী এখনো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভূমিকা পালনে সক্ষম

হচ্ছেন না। অর্থাৎ নারী রাজনীতি থেকে শুরু করে প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি স্তরে সমঅধিকার চর্চার অধিকারী নন।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নানামুখী উদ্দ্যোগে সরকারের সদিচ্ছাই প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় কর্ম পদ্ধতি (ন্যাশনাল প্লান অব এ্যাকশান) ঘোষণা করেছে। পঞ্চম পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) মাক্রো ফ্রেমওয়ার্কে জেন্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থরক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী গ্রহণ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে (কাদির, ১৯৯৮)। তবে শুধু মাত্র উদ্যোগ গ্রহণই যথেষ্ট নয়, গৃহীত উদ্যোগের কার্যকারিতা ও তার সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে এ বিষয়ে আন্তরিক ও সক্রিয় থাকতে হবে। যাতে করে যথার্থই রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ কার্যকর হয়।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষণীয়

অষ্ট্রেলিয়া নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সবসময়ই গুরুত্ব প্রদান করে আসছে যা বেইজিং সম্মেলনে প্রশংসিত হয়েছে। এক্ষেত্রে এদেশটিতে নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক "রেজিষ্টার অফ উইমেন" নামে ডাটাবেস প্রস্তুত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাতে দেশব্যাপী কর্মেচ্ছু বেকার মহিলাদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন সংস্থায় পাঠানো হয়। কম্পিউটারের যুগে এটা এমন কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয় এবং বাংলাদেশের পক্ষেও এটি সম্ভব। এছাড়াও অষ্ট্রেলিয়ার ইক্যুয়াল অপুরচ্যনিটি ফর উইমেন এ্যাক্ট (Equal Opportunity for Women ACT) ১৯৮৬ সাল থেকে কার্যকর রয়েছে।

আর্জেন্টিনায় ১৯৯৩ সালের "কোটা" ল অনুযায়ী প্রতিটি রাজনৈতিক দল জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে, নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ভাগ আসনে মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন না দিলে পার্টির রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হয়ে যায় । এবং এ প্রক্রিয়ায় ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে পার্লামেন্টে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সংখ্যা শতকরা ২৭ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

ইতালি দেশের প্রথম ওমবুডসম্যান (ombudsman) অর্থ্যাৎ ন্যায়পাল হিসেবে একজন মহিলাকে নিয়োগ করেছে এবং ন্যাশনাল কমিশন ফর ইক্যুয়ালিটি এন্ড ইক্যুয়াল অপরচুনিটি (National Commission for Equality and Equal Opportunity) স্থাপিত হয়েছে। এসব উদাহরণ থেকে বাংলাদেশ যথেষ্ট শিক্ষা নিতে পারে। উল্লেখ্য নামিবিয়া মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক থেকে উদাহরণ গ্রহণ করেছে (খান, ১৯৯৭:৫)।

পরবর্তী করণীয়

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। কারণ যে কোন প্লাটফর্মে প্রভাব বিস্তার করতে হলে তা রাজনীতির মাধ্যমেই করতে হবে। নারীর সমস্যাকে রাজনীতির ভাষায় সন্নিবেশিত করার জন্য নারীকে আরো অধিক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। নারী সমস্যার কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এসব সমস্যার বিশেষ দিকেগুলো চিহ্নিত করাও সেগুলো সমাধানের জন্য স্পষ্ট চিন্তাভাবনাও কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য নারীকেই ব্যাপক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। সে লক্ষ্যে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নারীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে মনোনীত নারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারকার্যে আর্থিক এবং সাংগঠনিক সহায়তা দান করতে হবে। রাজনীতিতে নারীর আগমনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ ও অস্ত্রের রাজনীতির উপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে। অধিকন্তু রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারী পুরুষ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি নারী সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসেতে হবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার ও গঠনতন্ত্র থেকে এটি স্পষ্ট যে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নারীর অবস্থান থাকা সত্ত্বেও কোন দলের লিখিত কর্মসূচিতে নারী উন্নয়ন বিষয়ক কোন ব্যবস্থা বা কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। অধিকন্তু রাজনৈতিক দলের নারী সদস্য সংখ্যা শীর্ষক সারণী থেকে লক্ষণীয় যে প্রতিটি দলের স্থায়ী কমিটি বা প্রেসিডিয়াম ও সেক্রেটারিয়েটে এবং কার্যনিবাহী কমিটিতে নারীর সংখ্যা নগণ্য। অর্থ্যাৎ দলীয় সিদ্ধান্তগ্রহণের পর্যায়ে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। রাজনৈতিক দলের কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে আরো অধিক সংখ্যায় নারীকে যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য ন্যূনতম সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে। রাজনীতি তথা

নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে নারীকে অধিক হারে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের মূলনীতি, কর্মসূচী ও ইসতেহারে নারী অধিকার ও সমতা সংক্রান্ত দাবি দাওয়া সন্নিবেশিত হতে হবে এবং সম্ভব হলে খাতওয়ারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সমস্যা চিহ্নিত করে তা মোকাবেলা বা নিরসনের দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

আইন সভায় কার্যকর নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচন প্রয়োজন । এ মুহূর্তে বর্তমান সপ্তম সংসদই নারীর সংরক্ষিত আসনের শেষ সংসদ। অতএব রাজনৈতিক দলগুলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। যেহেতু নির্বাচনে এখনো নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণ কম, তাই জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের সংখ্যা জেলাভিত্তিকভাবে ৬৪টি করা প্রয়োজন। এতে সদস্যগণ একক সদস্য ভৌগোলিক নিবার্চনী এলাকার ভিত্তিতে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসবে। অর্থ্যাৎ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীদের সমর্থনের ভিত তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হবে। যেহেতু আসন সংরক্ষিত থাকবে সেহেতু পুরুষ প্রার্থীর সাথে অসমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেতে হবে না। তবে বৃহৎ সাধারণ আসন অপেক্ষা সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনী এলাকা প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণের বিকল্প প্রস্তাব উদ্ভাবনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুপারিশ করা যেতে পারে । তবে এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ভাবে আইন করে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী মনোনয়নে অন্তত ২৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য। এ অবস্থা নিরসনকল্পে মন্ত্রীপরিষদে উল্লেখযোগ্য অনুপাতে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অর্থ্যাৎ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে অধিক হারে, ক্যাবিনেট পদসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে সুপ্রিমকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে সকল পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনের বোর্ডে অন্তত ২৫ শতাংশ নারী নিয়োগের বিধি প্রচলন করতে হবে। কেননা সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে নারীকে নিয়োগ দান করে সমাজে তাকে নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। অতি সম্প্রতি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্যের পদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নারীকে নিয়োগ করতে হবে। প্রশাসক হিসেবে নারী তার যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ রাখছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর পদচারণা সমাজের অন্য অংশের চেয়ে তুলনামূলক বিচারে বেশী । তাই এসকল ক্ষেত্রে নারীকে

নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করা হলে। সমাজে অনুকরণীয় রোল মডেল তৈরী হবে এবং নারীর নেতৃত্বমূলক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন' ৯৭ এর উল্লেখ্য যোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই প্রথম বারের মতো প্রতি ইউনিয়নে ৩ জন করে নারী প্রতিনিধি সরাসরি ভোটে মেম্বর নির্বাচিত হয়েছেন। যার মধ্য দিয়ে সারা দেশে তৃণমূল পর্যায় থেকে ১২৮২৮ জন নারী দেশের রাজনীতি ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশের কোন নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচন এই প্রথম। নারীর যথাযোগ্য নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যন্য সংযোজন। তাই এ সকল নারী সদস্যদের জন্য নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্যোগ গ্রহণে আন্তরিকতা বৃদ্ধির জন্য এ সকল সদস্যদের উন্নয়ন কৌশল, সমাজ কাঠামো নির্মাণ, স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইন কানুন, সামাজিক ও আইনগত অধিকার, হিসাব নিকাশ তথা সকল আধুনিক প্রযুক্তির বিষয় সম্বদ্ধে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এসকল কার্যক্রমে গণসংযোগ মাধ্যমগুলিসহ সকল এন, জি,ও এবং নারী সংগঠনগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাহলে এই দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে নারীর সমস্যা বা জেন্ডার কনর্সান রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে প্রাধান্য পাবে।

শিক্ষাই সচেতনতা বৃদ্ধির প্রধান শর্ততাই অধিক হারে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং একই সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে নারীর আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত তথ্য সংযোজিত করতে হবে। অধিকন্তু সকল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সকল স্তরে গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা এবং নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে সকলের মাঝে শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার আলোই নারীর প্রতি সকল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহায়ক হবে। বিশ্বব্যাপী নারীর সমক্ষতা ও ক্ষমতায়নের দাবী দৈহিক নয়, অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক ও সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক। কাজেই প্রকৃত শিক্ষাই সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে সমকক্ষতা অর্জনে মনস্তাত্ত্বিক বা চেতনার স্তরে পরিবর্তন আনয়ন করে নারীকে প্রকৃত ক্ষমতায় ক্ষমাতায়িত করবে।

তথ্য নির্দেশিকা

অনন্যা ১৯৯৮, বর্ষ, ১০, সংখ্যা- ২১। ঢাকা।

উইমেন ফর উইমেন (১৯৯৫) *নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান*। ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন।

উইমেন ফর উইমেন (১৯৯৬) *নারী বার্তা* প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন।

কাদির, সৈয়দা রওশন (১৯৯৮) *স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকা ও কার্যবলী*। স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্য শীর্ষক উইমেন ফর উইমেন এর বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন উপস্থাপিত, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৮।

খান, সালমা (১৯৯৭) বাংলাদেশে সিডও সনদের কার্যাকারিতা ও নারীর মর্যাদা । *ভোরের কাগজ*, ২৫শে আগষ্ট ১৯৯৭। ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৭) *The Local Goverment (Union Parishads) Second Amendment (ACT 1997)*. ঢাকা ঃ সরকারী মুদ্রণালয়।

চৌধুরী, নাজমা (১৯৯৪) *উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট, এ গাইড বুক ফর প্লানারস* (খসড়া রিপোর্ট)।

চৌধুরী, নাজমা এবং অন্যান্য (১৯৯২) নারীর ক্ষমতায়ন।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন। ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ই মে ১৯৯৮।

ধল, রবার্ট এ. (১৯৯৫) অধুনিক রাষ্ট্র নীতি বিশ্লেষণ। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (১৯৯৭) গঠনতন্ত্র, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত সংশোধিত, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্য নির্বাহী সংসদ (১৯৯৭-২০০০) সদস্যবৃন্দের তালিকা দ্রষ্টব্য, ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা, ৩রা জুন ১৯৯৯।

রহমান, অদিতি(১৯৯৮) প্রশাসনে নারী দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৮ *ঢাকা।*

রহমান, অদিতি(১৯৯৮) মেয়েরা এগোচ্ছো। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১০ নভেম্বর, ১৯৯৮।

রহমান, শাহীন (১৯৯৮) জেন্ডার প্রসঙ্গ। ষ্টেপস ট্যার্ডস ডেভেলপমেন্ট।

সুলতানা, আবেদা (১৯৯৬) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তিঃ একটি বিশ্লেষণ । *নারী বার্তা*, সংখ্যা -২। ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন।

হোসেন, শওকত আরা (১৯৯৮) নারীঃ রাজনৈতিক দল ও নর্বাচন । *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা-২। ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন।

Bambewala. Usha (1993) Women in politics : sciology of non- participation. a paper presented in a seminar on Impact of urbanization on women's welfare. Nether Lands Association of University women, 1983, p.2

Chowdury, Dilara And Almasud Hasanuzzaman (1997) Political decision mak ing in Bangladesh. and the role of women. *Asian profile*. vol. 25. No. 1.

Chowdhury, Najma (1994) *Women's Participation in politiecs: marginalisation and related issues in Nazma Chowdhury and et. al. (eds) Women and politics. Dhaka: Women for Women*

DAW(1990) Women 2000: review and appraisal 1990. Vienna : Division for the Advancement of Women.

FEMA(1996) *The Report of the Fair Montoring Alliance Bangladesh Parliamentary Election June. 12. 1996.* Dhaka: FEMA.

GOB(1991) *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, a*s modified up to 10th October, 1991.

Jahan,Roushanand etal. (1995) *Empowerment of women, Nairobi to Beijing (1985-1995).* Dhaka: Women for Women.

Menon, Rashed Khan (1994) "Political parties and women's agenda" Najma Chowdhury and et. al. (eds) Women and politics. Dhaka. Women for Women.

Morshed, SM. (1998) Comparative study on status of women workers in Bangladesh . Paper presented in a workshop on women workers orgasnised by ICFDU, -B.C Women committee in Dhaka. 22 June 1998.

Qadir, Sayeda Rowshan (1994) Participation of women at local level poiteics: problems and prospects in Najma Chowdhury and et. al. (eds). *Women and politics* . Dhaka: Women for Women

UN(1995) Report of the fourth world conference on women. Beijing, China. 17 October, 1995.

UN(1996) World wide Government Directory. Incorporate. United Nations: Division for the Advancement of Women.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রকাশিত পুস্তক/পত্রিকা ও মূল্য তালিকা

ক্রমিক নাং	শিরোনাম ও লেখক	প্রতি কপির দাম	কমিশনসহ
1	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা	৪০/০০	টাকাঃ ২০/০০
2	Bangladesh journal of Public Administration	40/00	TK.20/00
3	লোকপ্রশাসন সাময়িকী	১৫/০০	টাকা ৭/৫০
4	Post-entry Training in Bangladesh Civil Service: The Challenge & Response	40/00	TK.20/00
5	Career Planning in Bangladesh	102/00	TK. 60/00
6	Co-ordination in Public Administration in Bangladesh	100/00	TK..50/00
৭	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা	১২০/০০	টাকাঃ ৬০/০০
8	Sustainability of Project for Higher Agricultural Education	40/00	TK.20/00
9	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ganoshasthaya Kendra	40/00	TK.20/00
10	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of Rural Development Project in Bangladesh	40/00	TK. 20/00
11	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh	40/00	TK. 20/00
12	Handbook for the Magistrates	100/00	TK.50/00
13	A Study of the use of Computer	50/00	Tk. 25/00
14	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি	১২৫/০০	টাকা ৬২/৫০
15	Bureaucracy in Bangladesh perspective	500/00	Tk. 250/00
16	Limiting the Role State---	100/00	TK.100/00

লোকপ্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক বাংলা জার্ণাল। এতে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ নবীন লেখকদের বাংলা ভাষায় লিখিত লেখাসমূহ মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু লোকপ্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে লেখা/প্রবন্ধ সাময়িকীতে প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

◆ প্রবন্ধ অবশ্যই স্বরচিত ও মৌলিক হতে হবে এবং অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রহণ করা হবে না। প্রেরিত লেখার সাথে এই মর্মে লেখককে একটি বিবৃতি দিতে হবে।

◆ প্রবন্ধ সাদা কাগজে (A4 size) এক পৃষ্ঠায় ডাবল স্পেসে টাইপকৃত (কম্পিউটার কম্পোজ) হতে হবে। মূল কপিসহ পাণ্ডুলিপির ২ কপি ও Diskette জমা দিতে হবে।

◆ প্রবন্ধের উপরে আলাদা কাগজে প্রবন্ধের বাংলা ও ইংরেজী শিরোনামসহ লেখকের নাম উল্লেখ করতে হবে। প্রবন্ধের অন্য কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।

◆ প্রতিটি পান্ডলিপির সাথে অবশ্যই অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে ইংরেজীতে একটি নির্যাস (Abstract) থাকতে হবে।

◆ প্রবন্ধ অনধিক ৬০০০ (ছয় হাজার) শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে; মুদ্রিত ২০(বিশ) পৃষ্ঠা।

◆ প্রবন্ধে পাদটীকা, তথ্য নির্দেশিকা ও গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে প্রমিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। লোকপ্রশাসন সাময়িকীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করা হয়ঃ

বইঃ Siddiqui, Kamal (1996) *Towards good governance in Bangladesh.* Dhaka: UPL.

সিদ্দিকী, কামাল (১৯৯৬) *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্রঃ স্বরূপ ও সমাধান।* ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী।

জার্নালঃ Khan, Akbar Ali (1989) Decentralization for rural development in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Public Administration.* 3(1): 1-40.

রহমান, মোঃ হাসিবুর (১৯৯৮) প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগঃ কতিপয় কৌশল। *লোকপ্রশাসন সাময়িকী।* ১২ঃ১২৯-১৩৭।

◆ পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

◆ মনোনীত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে লেখককে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার জন্য ২০০(দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।